ব্রাম স্টোকার

ড্রাকুলা



বয়স ১৪+

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু

ব্রাম স্টোকার

ড্রাকুলা

ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিল মালবাহী রাশিয়ান জাহাজ ডেমিটার। দিন কয়েক যেতে না যেতেই নাবিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল আতঙ্ক। সবাই বুঝতে পারছে এই জাহাজে ভয়ানক কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে। কিন্তু সেটা যে কী তা কেউ জানে না। জাহাজ থেকে একে একে নিখোঁজ হতে শুরু করল নাবিকরা। মৃত্যুর আগে জাহাজের ক্যাপ্টেন বুঝতে পারলেন তারা জাহাজে করে বয়ে নিয়ে চলেছেন ভয়াল এক পিশাচকে। এভাবেই লণ্ডন শহরে এসে হাজির হলো কিংবদন্তীর রক্তলোভী পিশাচ কাউন্ট ড্রাকুলা। শহরজুড়ে ঘটতে শুরু করল গা শিউরানো সব ঘটনা।

সচিত্র কিশোর ক্লাসিক সিরিজ-৫২

ড্রাকুলা

(Dracula)

মূল : ব্রাম স্টোকার

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু





পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.

প্রকাশক
পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.
৪৩ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক (পুরাতন ১৬ শান্তিনগর), ঢাকা ১২১৭
ফোন : ৭১২৬২৭৪, ৯৩৩৫৮২৬, ৯৩৬০০৯৪, ৮৩৬০০০৭
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৩১৮৫২৬, ই-মেইল : info@panjeree.com

সম্পাদনা
নিলয় নন্দী

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১১

তৃতীয় মুদ্রণ
সেপ্টেম্বর ২০১২

দ্বিতীয় সংস্করণ
জুন ২০১৩

প্রচ্ছদ
রাজীব রায় রাজু

অঙ্গসজ্জা
এহসানুল হক

পরিবেশক
ভারত : শিশু সাহিত্য সংসদ (প্রা.) লিমিটেড, কলকাতা
যুক্তরাজ্য : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

মূল্য : ৮৫.০০ টাকা

Dracula a fiction by **Bram Stoker**, special adapted version for young readers in Bengali by **Anish Das Apu.**
Published by **Panjeree Publications Ltd**
43 Shilpacharya Zainul Abedin Sarak (Old 16 Shantinagar), Dhaka 1217
Indian Distributor : Shishu Sahitya Samsad Pvt. Ltd, Kolkata
UK Distributor : Sangeeta Ltd, 22 Brick Lane, London
First published in February 2012. Price : **Taka 85.00, US$ 5.00**

ISBN : 978-984-634-032-7

এই বইয়ে তোমরা যাদের মুখোমুখি হবে

কাউন্ট ড্রাকুলা : রোমানিয়ার ট্রানসিলভানিয়ার বসবাসকারী রহস্যময় এক চরিত্র। প্রকৃতপক্ষে সে একজন পিশাচ। মানুষের রক্ত পান করে বেঁচে থাকে।

জোনাথন হারকার : ইংল্যান্ডের একজন আইনজীবি। তাঁকে তার কর্মস্থল থেকে কাউন্ট ড্রাকুলার কাছে সম্পদ বিষয়ক কাজে পাঠানো হয়। সাময়িকভাবে তিনি ড্রাকুলার দুর্গে বন্দী হন।

মিনা মুর : জোনাথনের প্রেমিকা। পরবর্তীতে তাঁদের বিয়ে হয়। অত্যন্ত সাহসী ও কর্তব্যপরায়ণ মেয়ে।

লুসি ওয়েস্টেনরা : মিনার বান্ধবী। ড্রাকুলার শিকারে পরিণত হয়ে সে নিজেও রক্তচোষা পিশাচরূপ ধারণ করে।

ভ্যান হেলসিং : একজন ডাচ অধ্যাপক। চিকিৎসাবিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র ও অধ্যাত্মবাদ এই তিনটির ওপরেই অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। ড্রাকুলার বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন তিনি।

জন সেওয়ার্ড : মানসিক রোগীর চিকিৎসক। লন্ডনের একটি পাগলাগারদে কর্মরত। তিনি লুসিকে ভালোবেসে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ড্রাকুলার বিরুদ্ধে তিনিও প্রবল সংগ্রামে নামেন।



লেখক পরিচিতি

ব্রাম স্টোকারের জন্ম আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে, ১৮৪৭ সালে। শৈশব থেকেই রোগে ভুগতেন ব্রাম। অসুস্থ ছেলের বিছানার পাশে বসে মা তাঁকে আইরিশ পরি, দৈত্যদানো আর ভূতপ্রেতের গল্প শোনাতেন। ব্রাম বাবার লাইব্রেরি থেকে নিয়ে আসা নানান গল্পের বইও গিলতেন গোগ্রাসে।

বড় হয়ে ব্রাম ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন। গ্রাজুয়েশন শেষ করে ব্রাম স্টোকার কিছুদিনের জন্যে সরকারি চাকরি করেন। নাটক দেখতে খুব পছন্দ করতেন, পরে একজন নাট্য সমালোচক হিসেবে তাঁর আবির্ভাব ঘটে।

শেক্সপিয়রের 'হ্যামলেট' নাটকে হেনরি আর্ভিং নামে একজন অভিনেতা অভিনয় করতেন। ব্রাম স্টোকারের সঙ্গে তাঁর পরবর্তী সময়ে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আর্ভিং একটি প্রেক্ষাগৃহ চালানো এবং নিজের অভিনয় ক্যারিয়ারে সহযোগিতার জন্যে ভাড়া করেন ব্রামকে। তিনি ওই সময় বাচ্চাদের জন্যে *আন্ডার দ্য সানসেট* নামে একটি ভূতের বই লেখেন। ১৮৯০ সালে তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাসটি লেখেন।

ভ্যাম্পায়ারদের নিয়ে একটি গল্প শুনেছিলেন ব্রাম স্টোকার। গল্পটি ভীষণভাবে তাঁর মনে গেঁথে যায়। তিনি রক্তপায়ী অদ্ভুত প্রাণীদের নিয়ে লেখা উপকথাগুলো গোগ্রাসে গিলতেন। বিশ্বের ভয়ংকরতম পিশাচকাহিনী 'ড্রাকুলা' ১৮৯৭ সালে যখন প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ।

ব্রাম স্টোকার সব মিলিয়ে আঠারোখানা বই লিখেছেন। এর মধ্যে চারটি বই অতিপ্রাকৃত বা ভূতপ্রেতদের নিয়ে। তিনি ১৯১২ সালে ৬৪ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।



আপনার একটি চিঠি আছে

১. ট্রানসিলভানিয়ার হোটেলে

পুরোনো হোটেলের জানালা দিয়ে আনমনে বাইরে তাকিয়েছিল জোনাথন হারকার। ইংল্যান্ড থেকে কত দূরে এসে পড়েছে সে! এ হোটেলেই ওর

নামে ভাড়া করা হয়েছে ঘর। গৃহস্থালির কাজ করে যে বুড়ি মহিলা, প্রাচীন হোটেলটির মতো তার বয়সও কম নয়।

'আপনার একটি চিঠি আছে,' জোনাথনকে একটা খাম দিল বৃদ্ধা।

দ্রুত খাম খুলল জোনাথন। জানে এ চিঠি একজনই পাঠাতে পারে যার আমন্ত্রণে সে এই অদ্ভুত সফরে বেরোতে বাধ্য হয়েছে।

কয়েক লাইনের চিঠি। পড়ল জোনাথন :

বন্ধু ট্রানসিলভানিয়ায় স্বাগতম। কাল কোচ (চার চাকার ঘোড়ার গাড়ি) নিয়ে চলে আসুন বোর্গো পাস-এ। আমার ঘোড়ার গাড়ি যাবে আপনাকে আমার প্রাসাদে নিয়ে আসার জন্যে। আপনার বন্ধু– ড্রাকুলা।

চিঠিটি পড়ে মনে মনে খুশি হলো জোনাথন। লম্বা ভ্রমণের অবশেষে অবসান ঘটতে যাচ্ছে জেনে ও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ইংল্যান্ড থেকে শুরু হয়েছে যাত্রা, গোটা ইউরোপ ঠেঙিয়ে আসতে হয়েছে। পাহাড়, নদী, ঘনজঙ্গল পার হয়েছে জোনাথন। মহাদেশের একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ট্রানসিলভানিয়া। মানচিত্রের কোথাও সে ওর আমন্ত্রণকর্তা কাউন্ট ড্রাকুলার প্রাসাদের চিহ্ন দেখে নি।

কাউন্ট ড্রাকুলার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে মুখিয়ে আছে জোনাথন। এখানে আসার পথে আজব সব দৃশ্য চোখে পড়েছে। এসব ব্যাপারে জানতে চাইবে ও ড্রাকুলার কাছে। এ অঞ্চলে যারা থাকে তাদের প্রায় সবাই হুন এবং তুর্কি বংশোদ্ভূত। এদের চুল লম্বা, সবার মুখে ঘন কালো দাড়ি। এদিককার পাহাড়গুলো বড্ড খাড়া এবং বিপদসংকুল। আসবার পথে প্রতিটি স্থানের বর্ণনা লিখে নিয়েছে ও ডায়েরিতে। খুব সুন্দর এখানকার নিসর্গ। বাড়ি ফিরে বাগদত্তা মিনাকে বলবে সব।

জোনাথন যুবক বয়সী এক আইনজীবী। এতদূর এসেছে কাউন্ট ড্রাকুলার সঙ্গে দেখা করতে। কাউন্ট লন্ডনে একটি বাড়ি কিনেছে, তবে কোন এলাকায় কেউ জানে না।

জোনাথন হোটেল-মালিক এবং তার স্ত্রী সেই বৃদ্ধার কাছে যখন কাউন্টের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে চাইল, সভয়ে তারা বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল।



অবশেষে অবসান ঘটতে যাচ্ছে এই দীর্ঘ যাত্রার

একটি কথাও বলল না। ব্যাপারটি অদ্ভুত লাগল জোনাথনের কাছে। আরও অস্বস্তি হলো যখন বৃদ্ধা ওকে বারবার বলতে থাকল, 'ওখানে আপনাকে কি যেতেই হবে, না গেলেই কি নয়?'

ওখানে গেলে কী সমস্যা জানতে চাইল জোনাথন।

'আজ সেন্ট জর্জের ভোজ। মধ্যরাতে পৃথিবীর সব ভূতপ্রেত জেগে উঠবে। আপনার কি কোনো ধারণা আছে আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল বৃদ্ধা।

শেষ পর্যন্ত হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল সে, কাতর গলায় অনুনয় করতে লাগল জোনাথন যেন কোথাও না যায়। কিন্তু জোনাথন নিজের সিদ্ধান্তে অটল দেখে বৃদ্ধা ওর গলায় একটি জপমালা আর ক্রুশ পরিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনার মায়ের কসম এগুলো কখনও গলা থেকে খুলবেন না।'

কোচের ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলল বাড়িওয়ালি। ওরা স্থানীয় ভাষায় কথা বলছে। অভিধান ঘেঁটে সেইসব শব্দের অর্থ বের করতে গিয়ে কপালে ভাঁজ পড়ল জোনাথনের। ওরা 'শয়তান', 'ডাইনি' এবং 'ভ্যাম্পায়ার' নিয়ে কথা বলছিল। কাউন্ট ড্রাকুলার কাছে জোনাথন এসব স্থানীয় কুসংস্কার সম্পর্কে জেনে নেবে।

কোচ তার যাত্রীকে নিয়ে বুনো অঞ্চলে ঢুকে পড়ল। চারপাশে পাইনের ঘন বন। অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে আছে। এবড়োখেবড়ো রাস্তা। তবু চালক তার ঘোড়াগুলোকে ক্রমাগত চাবুক মেরে চলেছে আরও দ্রুত চলার জন্যে।

ওরা অনেক দূরের পাহাড়ে চলে এসেছে, বিশ্রী রাস্তায় এমন জোরে ঝাঁকি খাচ্ছে কোচ, যেন সাগরে ঝড়ের কবলে পড়েছে নৌকা।

বোর্গো পাস হলো পাহাড়ি রাস্তাটার মাঝখানের একটা ফাটল বা খাদ। ফাটলটাকে ঘিরে রেখেছে ঘন, কালো জঙ্গল। কোচ থামতেই গাড়ি থেকে নেমে পড়ল জোনাথন। গা কাঁপছে ওর, অস্বস্তিকর, ছমছমে একটা অনুভূতি ঘিরে ধরছে। অনুভূতিটাকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো ও।

হঠাৎ পাহাড়ের ওপাশের রাস্তা ধরে ভোজবাজির মতো উদয় হলো ঘোড়ায় টানা আরেকটি গাড়ি। চারটে কালো ঘোড়া টেনে নিয়ে আসছিল গাড়িটিকে, চালকের আসনে বসা ঢ্যাঙা এক লোক। মাথার মস্ত কালো

টুপিতে তার মুখটা ঢাকা। চেহারা চেনা যায় না। সে একটা হাত বাড়িয়ে দিল জোনাথনের দিকে। ওকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করল। লোকটার মুঠো যেন ইস্পাতের তৈরি। ভীষণ শক্ত এবং ঠাণ্ডা। জোনাথন গাড়িতে ওঠার সময় এক ঝলক লোকটার মুখ দেখতে পেল। তবে পুরো অবয়ব নয়, শুধু চোখ আর দাঁত! অঙ্গারের মতো জ্বলজ্বল করছে চালকের চোখ, দাঁতগুলো সরু এবং ধারালো।

কোচ ফিরে চলল নিজের গন্তব্যে। ঘোড়ার গাড়ি আর তার অদ্ভুত ড্রাইভারের সঙ্গে জোনাথনকে একা রেখে চলে গেল।

হঠাৎ ভীষণ শীত করে উঠল জোনাথনের। কোথায় চলেছে সেটা জানে না বলেই বোধ হয় প্রচণ্ড একাকী লাগছে নিজেকে।

'আজ খুব শীত পড়েছে,' বলল গাড়ির চালক। 'আমার প্রভু, কাউন্ট ড্রাকুলা বলে দিয়েছেন আপনার সেবাযত্নের যেন কোনো ত্রুটি না হয়। এই কম্বলটা গায়ে পেঁচিয়ে নিন। তাহলে আর ঠাণ্ডা কাবু করতে পারবে না। আপনার আসনের তলায় ব্রান্ডির বোতল আছে। ব্রান্ডি পান করতে পারেন। গরম লাগবে গা।'

অনেক দূরে অকস্মাৎ গলা ছেড়ে ডেকে উঠল একটা কুকুর। তারপর আরও দূর থেকে আরেকটা কুকুর সাড়া দিল তার সঙ্গীর ডাকে। খানিক বাদে তীক্ষ্ণ, কানফাটানো একটা চিৎকার প্রতিধ্বনি তুলল পাহাড়ের গায়ে বাড়ি খেয়ে– নেকড়ের গর্জন। আতংকের চোটে লাফিয়ে উঠল ঘোড়াগুলো। জোনাথন এমন ভয় পেয়েছে, আরেকটু হলেই গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে যাচ্ছিল।

ঘোড়ার গাড়ি রাতের আঁধার ভেদ করে ছুটে চলেছে। কালো কালো গাছের একটা টানেল বা সুড়ঙ্গ দিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। হুংকার ছাড়ছে বাতাস, সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে শীতের তীব্রতা। তুষার পড়ছে। চতুর্দিকে নেকড়ের গর্জন। কিন্তু তাতে চালকের ভ্রুক্ষেপ মাত্র নেই।

বেশ কয়েকবার ঘোড়ার গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল চালক। জঙ্গলে রহস্যময়ভাবে জ্বলতে থাকা নীলচে কতকগুলো অগ্নিশিখার দিকে ছুটে



জোনাথন আরেকটু হলেই গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে যাচ্ছিল

গেল। হাত দিয়ে চোখ কচকাল জোনাথন। এ কী দেখছে ও! চালকের শরীর ভেদ করে শিখাগুলো দেখা যাচ্ছে! লোকটার শরীর কি কাচের তৈরি? ফিরে এসে আবার চালকের আসনে উঠে পড়ল লোকটা।



গাড়ির চারপাশ ঘিরে রেখেছে নেকড়ের দল

কিছুক্ষণ পরে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল ঘোড়ার গাড়ি। চালক মিলিয়ে গেল আঁধার রাজ্যে। জোনাথন লোকটার ফিরে আসার অপেক্ষায় বসে রইল। ওর কেমন ভয় ভয় লাগছে। হঠাৎ ঘোড়াগুলো কাঁপতে লাগল, চিঁহিঁহিঁ ডাক ছাড়ল আতংকিত গলায়।

'ঘটনা কী?' আপন মনে প্রশ্ন করল জোনাথন। 'এখন তো নেকড়ের ডাক শোনা যাচ্ছে না! তাহলেও ঘোড়াগুলো ভয় পাচ্ছে কেন?'

অন্ধকারে তাকিয়ে রইল জোনাথন। মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়া চাঁদ আড়াল থেকে বেরিয়ে আসার পরে যে দৃশ্য ও দেখতে পেল, তাতে তার আত্মা খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড়। গাড়ির চারপাশ ঘিরে রেখেছে নেকড়ের দল। জোছনার আলোয় ঝকমক করছে তাদের তীক্ষ্ণধার সাদা দাঁত এবং গায়ের লোম। চোয়ালের পাশ দিয়ে বেরিয়ে আছে লাল টকটকে জিভ। তবে সবাই নিশ্চুপ। ওদের ডাকের চেয়েও ভীতিকর এই ভয়ংকর নিস্তব্ধতা। একা, অন্ধকারে তীব্র ভয়ে জোনাথনের রক্ত যেন জমাট বেঁধে গেল, নড়াচড়ার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে।

হঠাৎ সব কটা নেকড়ে এক যোগে হুংকার ছাড়ল, যেন কেউ তাদেরকে হুকুম দিয়েছে। লাফিয়ে উঠল ভীত ঘোড়াগুলো, পিছিয়ে যাচ্ছে। কোটরের মধ্যে ঘুরছে তাদের চোখ। জোনাথন গাড়ির এক পাশে জোরে জোরে বাড়ি মারতে লাগল যাতে শব্দ শুনে ভয়ংকর প্রাণীগুলো পালিয়ে যায়।

কিন্তু নেকড়ের দল এগিয়ে আসতে লাগল।

২. ভয়াল দুর্গ

নেকড়ের পাল এগিয়ে আসছে, এমন সময় ঘোড়ার গাড়ির চালকের সাড়া পেল জোনাথন। চলে এসেছে সে। লোকটা নেকড়েগুলোকে দেখে ধমকে উঠল। হাত নেড়ে পিছিয়ে যেতে হুকুম দিচ্ছে। চালকের আদেশ মেনে নিল ভয়ংকর জন্তুগুলো, গাড়িটাকে ছেড়ে দিয়ে আঁধারে মিলিয়ে গেল তারা।

এমন ভয় পেয়েছে জোনাথন, রীতিমতো কাঁপছে। ঘোড়ার গাড়ি আবার পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে শুরু করল যাত্রা। এবারে খাড়া ঢাল বেয়ে ওপর দিকে উঠছে।

গাড়ির দুলুনিতে জোনাথন বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। চোখ মেলে দেখে গাড়িটি থেমে আছে এক বিশাল আঙিনায়। আঙিনার সামনে পাথরের মস্ত এক ভবন। ঘোড়ার গাড়ির চালক আবার সেই বরফশীতল বজ্রমুঠিতে চেপে ধরল জোনাথনের হাত, ওকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিল। এরপর রহস্যময় লোকটা গাড়ি নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল একটা খিলানের আড়ালে।

আমি কি স্বপ্ন দেখছি? নিজেকে প্রশ্ন করে জোনাথন। এ কোন অদ্ভুত জায়গায় এসেছি! দরজায় তো কোনো কড়াও দেখছি না যে নক করব। ভোর অবধি কি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে?

হঠাৎ শিকলের ঝনঝন শব্দ হলো। পেরেক বসানো প্রাসাদের দরজা খুলে গেল ধীরে ধীরে। কালো পোশাক পরা, তালগাছের মতো লম্বা বয়সী এক লোক এসে দাঁড়াল চৌকাঠে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জোনাথনের দিকে।

'আমার বাড়িতে স্বাগতম,' বলল সে। 'আসুন, ভেতরে আসুন।'

জোনাথন চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকেছে, লোকটা ওর হাত চেপে



কাউন্টের হাতগুলো সত্যিই অদ্ভুত!

ধরল। ভয়ানক ঠাণ্ডা হাত মরা মানুষের মতো শীতল। আর হাতে কী জোর! ঘোড়ার গাড়ির সেই চালকের মতো।

'কাউন্ট ড্রাকুলা?' জিজ্ঞেস করল জোনাথন।

'জ্বি, আমিই ড্রাকুলা। আপনাকে স্বাগতম, মি. হারকার।'

কাউন্ট নিজেই জোনাথনের ব্যাগগুলো তুলে নিল হাতে।

কিছুক্ষণ পরের কথা। জোনাথন ড্রাকুলার প্রাসাদের ডাইনিং রুমে খেতে বসেছে। মুরগীর রোস্ট আর সালাদ পরিবেশন করা হয়েছে। কাউন্ট খাবার ছুঁয়েও দেখে নি। সে নাকি কিছুক্ষণ আগেই সেরে নিয়েছে রাতের খাবার। জোনাথনকে সঙ্গ দিতে ওর সঙ্গে বসেছে। ভ্রমণ কেমন হলো, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নানান প্রশ্ন করছে।

খেতে খেতে কাউন্ট ড্রাকুলাকে লক্ষ করছিল জোনাথন।

লোকটার কপাল বেশ উঁচু, ঘন ঝোপের মতো ভুরু। কথা বলার সময় টকটকে লাল ঠোঁটের ফাঁকে ঝিকিয়ে উঠছে ধারালো সাদা দাঁতের সারি। তার কান জোড়া সুচালো, গায়ের চামড়া ভীষণ বিবর্ণ।

তবে কাউন্টের হাতজোড়া সবচেয়ে অস্বাভাবিক ঠেকল জোনাথনের কাছে। কাউন্টের হাতের তালুতেও মোটা মোটা লোম গজিয়েছে। নখগুলো বিশ্রী রকম লম্বা, ডগাগুলো সুচালো। একবার কাউন্ট হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল জোনাথনকে। জোনাথনের গা রি-রি করে উঠল।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে জোনাথন দেখল রাতের আকাশে ভোরের প্রথম সূচনাবার্তা ঘোষণা করছে। সবকিছু আশ্চর্যরকম নিস্তব্ধ এবং নিথর। নিচের উপত্যকা থেকে ভেসে এল নেকড়ের পালের সম্মিলিত চিৎকার।

চকচক করে উঠল কাউন্টের চোখ, ফিসফিস করল, 'কান পেতে শুনুন। ওরা রাতের সন্তান। কী সুন্দর গানই-না গাইছে ওরা!'

জোনাথনকে শুভরাত্রি জানিয়ে চলে গেল কাউন্ট ড্রাকুলা। শুতে যাওয়ার সময় জোনাথন ঘটে যাওয়া বিচিত্র ঘটনাগুলোর কথা ভাবছিল। ক্লান্ত শরীরে কখন চোখ লেগে এসেছে জানে না।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে জোনাথন দেখল টেবিলে ওর নাশতা ঢাকা দেওয়া, সঙ্গে একটি চিরকুট। কাউন্ট লিখেছে বিশেষ কাজে তাকে


কান পেতে শুনুন– ওরা রাতের সন্তান

বাইরে যেতে হচ্ছে। নাশতার টেবিলে অতিথিকে সময় দিতে পারছে না বলে সে অত্যন্ত দুঃখিত।

ড্রাকুলার প্রাসাদের সবকিছুই অত্যন্ত বিলাসবহুল এবং দামি। খাবার

প্লেটগুলো পর্যন্ত খাঁটি সোনার তৈরি। দেখলেই বোঝা যায় বহু পুরোনো। তবে অদ্ভুত ব্যাপার, ঘরে কোনো আয়না নেই, এমনকি বাথরুমেও নেই। এত বড় প্রাসাদ অথচ কোনো ভৃত্য চোখে পড়ল না জোনাথনের। নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ লাগছে ওর।

সারাটা দিন কাউন্টের লাইব্রেরিতে বই পড়ে কাটিয়ে দিল জোনাথন। ইংল্যান্ড সম্পর্কে প্রচুর বই আছে। সন্ধ্যার পরে এসে হাজির কাউন্ট।

'আপনার দেশ সম্পর্কে লেখা সমস্ত বই-ই আমার পড়া,' বলল কাউন্ট। 'আমি আপনাদের ভাষা শিখতে চাই। আমাকে দয়া করে আপনাদের ভাষা শিখিয়ে দেবেন।'

'কিন্তু কাউন্ট, আপনি তো ইংরেজি ভালই বলেন,' বলল জোনাথন।

'তেমন একটা ভাল বলি না। লন্ডনের সবাই আমার কথা শুনলেই বুঝে ফেলবে ওদেশে আমি নতুন। কাজেই আমি পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়ে আপনাদের দেশে যেতে চাই যাতে সবার সঙ্গে সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারি।'

'আচ্ছা, বুঝলাম,' বলল জোনাথন।

'একেক দেশের একেক রকম রীতি-নীতি-সংস্কৃতি,' বলে চলল কাউন্ট। 'আমরা এখন আছি ট্রানসিলভানিয়ায়, ইংল্যান্ডে নই। এখানে অনেক কিছুই আপনার কাছে অদ্ভুত লাগতে পারে। সে যাকগে, লন্ডনে আমার নতুন বাড়িটির কথা বলুন।'

'আপনার নতুন বাড়িটি কারফ্যাক্স নামে একটি জায়গায়,' বলল জোনাথন। কাউন্টকে বাড়ি কেনার কাগজপত্র দেখাল। 'বাড়ির সামনে গভীর একটি পুকুর আছে। বাড়িটির আকার বিরাট এবং অনেক পুরোনো। ওখানে পরিত্যক্ত একটি চ্যাপেলও (উপাসনালয়) আছে। কাছেপিঠে রয়েছে কয়েকটি ঘরবাড়ি। এর মধ্যে একটি বাড়িকে আবার পাগলাগারদে রূপান্তর ঘটানো হয়েছে। তবে পাগলাগারদটি আপনার বাড়ি থেকে দেখা যায় না।'

'আমার বাড়িটি প্রাচীন আমলের শুনে খুশি হলাম,' বলল কাউন্ট। 'নতুন

বাড়ি-টাড়ি আমার পছন্দ নয়। চ্যাপেল আছে জেনেও ভালো লাগল। চ্যাপেল মানেই সমাধিস্থল। আমি অন্ধকার, বিষণ্ন জায়গা পছন্দ করি। ওসব জায়গায় আমাকে কেউ বিরক্ত করতে আসবে না। নিজের ভাবনায় ডুবে থাকতে পারব।'

আজ রাতের খাবারেও জোনাথনের সঙ্গে যোগ দিল না কাউন্ট। বলল সে আগেই খেয়ে নিয়েছে। জোনাথন খাচ্ছে, ওর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গল্প জুড়ে দিল কাউন্ট। হঠাৎ একটা মোরগ ডেকে উঠে জানিয়ে দিল ভোর হয়েছে। মোরগের ডাক শুনে লাফিয়ে খাড়া হলো কাউন্ট।

'আপনার ইংল্যান্ডের গল্প শুনতে শুনতে কখন রাত কাবার হয়ে গেছে খেয়ালই করি নি,' বলল কাউন্ট। 'দেখুন তো খামোখা আপনার ঘুমের দেরি করিয়ে দিলাম। যান, শুয়ে পড়ুনগে।'

ঘণ্টা কয়েক ঘুমাল জোনাথন। ঘুম থেকে জেগে উঠে শেভ করতে বসল। দাড়ি কামানোর জন্যে ছোট একটি আয়না নিয়ে এসেছে ও। আয়নায় তাকিয়ে শেভ করছে, হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন হাত রাখল কাঁধে। চমকে গেল জোনাথন। পাঁই করে ঘুরল। কাউন্ট ড্রাকুলা!

'সুপ্রভাত,' বলল কাউন্ট।

কাউন্ট কখন ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে টেরই পায় নি জোনাথন। আয়নায় তো কাউন্টকে আসতে দেখে নি ও। আবার আয়নায় তাকাল জোনাথন। আরে, এ কী দেখছে ও! আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কাউন্ট অথচ তার কোনো প্রতিচ্ছবিই পড়ছে না ওতে।

জোনাথন এমন চমকে গেছে, দাড়ি কামাতে গিয়ে ক্ষুরের আঘাতে কেটে গেল গালের চামড়া। ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরতে লাগল রক্ত। গাল বেয়ে নামছে ঘাড়ে। রক্তের ক্ষীণ ধারার দিকে তাকিয়ে ভয়ানক জ্বলে উঠল কাউন্টের দুই চোখ। হঠাৎ সে বাড়িয়ে দিল তার হাত। হাতটা পিছলে গিয়ে বাড়ি খেল জোনাথনের গলায় ঝোলানো ক্রুশে যেটা হোটেলের বৃদ্ধা ওকে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে এল কাউন্টের। শান্ত হয়ে গেল সে।



ফেলে দিন তো এসব ফালতু জিনিস!

'এ দেশে দাড়ি কামানোর সময় সাবধান,' জোনাথনকে সতর্ক করল ড্রাকুলা। 'খেয়াল রাখবেন গাল-টাল যেন কেটে না যায়। বিপদ হতে পারে। আর এসব জিনিসের দরকার কী আপনার? ফেলে দিন তো এসব ফালতু জিনিস!' বলে জোনাথনের ছোট আয়নাটা নিয়ে সে জানালা দিয়ে

ছুড়ে ফেলে দিল। নিচে, পাথুরে মেঝেতে পড়ে ভেঙে শতখান হলো কাচ। কথা না বাড়িয়ে চলে গেল কাউন্ট।

জোনাথনকে একাই নাশতা সারতে হলো। এখানে আসার পরে একদিনও কাউন্টকে কিছু খেতে কিংবা পান করতে দেখে নি ও। মানুষটা আজব তো! ভাবছে জোনাথন।

নাশতা সেরে প্রাসাদ ঘুরে দেখতে বেরোল ও। লক্ষ করল প্রাসাদটি খাড়া একটি পাহাড়চুড়োর ওপর অবস্থিত। খাড়া, নিরেট ঢাল ঝপ করে নেমে গেছে হাজার ফুট নিচে। খোলা জানালা দিয়ে যেদিকেই তাকানো যায় খাড়া ঢালটাই আগে চোখে পড়বে। ঢালের নিচে বনভূমি।

তবে জোনাথন শিগগিরই আরেকটা জিনিস আবিষ্কার করল। দরজাগুলো সব বাইরে থেকে বন্ধ। প্রাসাদটা আসলে একটা কারাগার– আর ও কারাগারের বন্দি!

নিজের ঘরে ফিরে এল জোনাথন। দেখল কাউন্ট ওর বিছানা করে দিচ্ছে। ও মনে মনে যা সন্দেহ করেছে তা-ই তাহলে সত্যি! প্রাসাদে চাকর-বাকর নেই। প্রকাণ্ড এ প্রাসাদে ড্রাকুলার সঙ্গে একা জোনাথন। ও এখন নিশ্চিত সে রাতের ঘোড়ার গাড়ির চালক অন্য কেউ ছিল না, ছিল ড্রাকুলা স্বয়ং! তার হুকুমেই সেদিন নেকড়েগুলো জোনাথনকে হামলা চালাতে সাহস করে নি। বনের নেকড়েও ড্রাকুলার আদেশ মেনে চলে!

জোনাথন বুঝতে পারল ও ভয়ানক বিপদে আছে। এই প্রথম ভেবে স্বস্তি পেল যে, বুড়ি হোটেলওয়ালি ওকে একটা ক্রুশ দিয়েছে। এ ক্রুশটাই বোধ হয় ওর কাছে ঘেঁষতে দেবে না ড্রাকুলাকে। সে কোনো ক্ষতি করতে চাইলেও বাধা পাবে।

সে রাতে প্রাচীন যুদ্ধের গল্প শোনাল ড্রাকুলা। এমনভাবে বর্ণনা করল যেন সে নিজেই ওসব যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। বলল সে কীভাবে অনেক রক্তাক্ত যুদ্ধে জয়ী হয়েছে।

'কিন্তু ওই যুদ্ধের দিন এখন শেষ,' বলল কাউন্ট। 'আজকাল বিনা কারণে কেউ রক্ত ঝরায় না। আসলে রক্তের দাম আছে।'



ঠিক তখন পুবাকাশে ফুটল ভোরের আলো। তড়িঘড়ি চলে গেল কাউন্ট। বলল ঘুমোতে যাবে। এ রকমই তো সে করছে প্রতিদিন। ভোর হওয়ার সময় ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে চলে যায়।

জোনাথন দিনটি কাটিয়ে দিল লাইব্রেরিতে বই পড়ে। সন্ধ্যায় ওর সঙ্গে দেখা করতে এল কাউন্ট। জানাল আইনি কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলবে।

'ইংল্যান্ডের একটি বন্দরে আমার কিছু জিনিসপত্র পাঠাতে চাই আমি,' বলল সে। 'জিনিসগুলো বুঝে নেওয়ার জন্যে একজন আইনজীবীর প্রয়োজন হবে আমার।'

'আমাদের পরিচিত যে কোনো আইনজীবীকে দিয়ে আপনার কাজ করিয়ে নেওয়া যাবে,' বলল জোনাথন।

'আপনি আপনার চাকরিদাতা এবং বন্ধুদেরকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিন দেশে ফিরতে আপনার আরও কিছুদিন দেরি হবে,' বলল ড্রাকুলা। 'ধরুন মাসখানেক আমার সঙ্গে থাকতে হবে আপনাকে।'

'এতদিন?' বুক শুকিয়ে গেছে জোনাথনের।

'আপনি আপত্তি করলেই তা মানছে কে?' বলল কাউন্ট।

রাজি না হয়ে উপায়ও নেই জোনাথনের। ওর চাকরিদাতা মি. হকিন্স বলে দিয়েছেন কাউন্টকে যেন সে উদারভাবে সাহায্য করে, কাউন্টের কোন আদেশ অমান্য করা যাবে না।

'চিঠিতে কাজের কথা ছাড়া অন্য কিছু যেন লিখবেন না,' হুমকির সুর কাউন্টের গলায়। 'ওদেরকে বলুন এখানে আপনি ভালোই আছেন এবং ওদেরকে দেখার জন্যে উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন। ব্যস, বাড়তি আর একটি শব্দও নয়।'

হেসে জোনাথনকে লেখার কাগজ দিল কাউন্ট ড্রাকুলা। হাসার সময় দুই ঠোঁটের পাশ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল শ্বদন্তের মতো দুটো ধারালো দাঁত। ওদিকে চোখ পড়তে শিউরে উঠল জোনাথন।

বিদায় নেওয়ার আগে কাউন্ট বলল আজ রাতে সে ব্যস্ত থাকবে। কাজেই নৈশ ভোজে সে বরাবরের মতো সঙ্গ দিতে পারবে না জোনাথনকে।

'সাবধান!' বলল সে, 'নিজের ঘর ছাড়া প্রাসাদের অন্য কোন ঘরে যেন ঘুমোতে যাবেন না। তাড়া করবে দুঃস্বপ্ন।'

এ অদ্ভুত প্রাসাদে বন্দি হয়ে থাকার চেয়ে দুঃস্বপ্ন দেখা নিশ্চয় কম ভীতিকর, ভাবছে জোনাথন। রাতের বেলা নিজের ঘর থেকে বেরোল ও। জানালার ধারে একটা সিঁড়ি আছে। ওখানে গিয়ে বাইরে তাকাল জোনাথন।

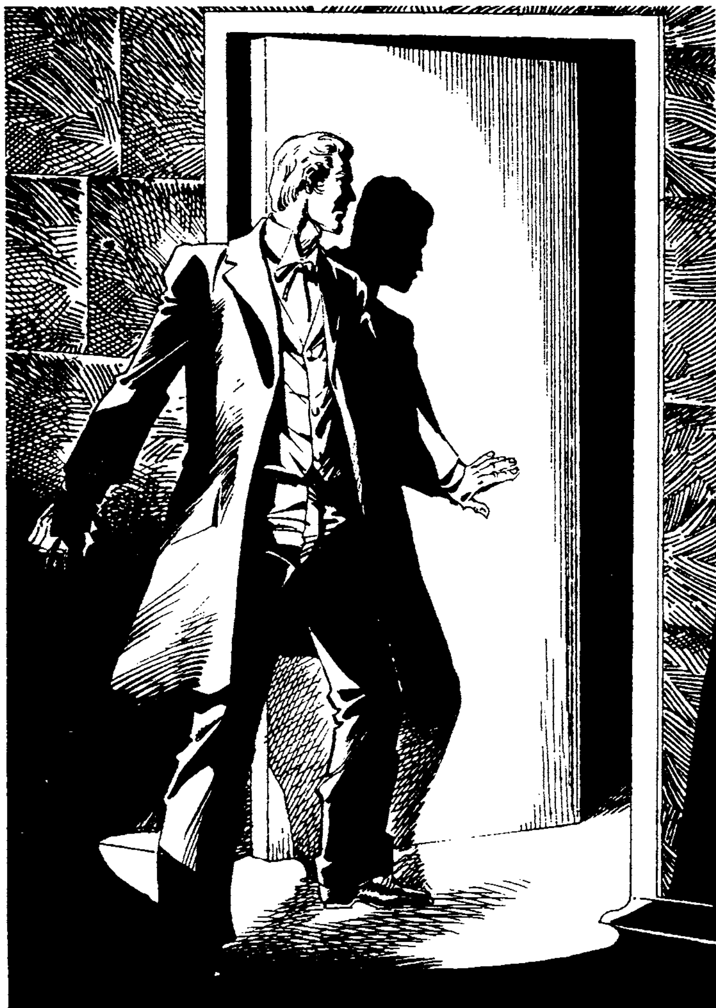
ঠিক তখন একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল ওর। কাউন্টের ঘরে কে যেন হাঁটাহাঁটি করছে। পিছিয়ে এলো জোনাথন। তারপর সাবধানে উঁকি দিল।

ওই ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে কাউন্ট। চেহারা দেখা যাচ্ছে না তবে ওটা যে কাউন্ট তা বুঝতেও অসুবিধে হচ্ছে না জোনাথনের। কাউন্টের রোমশ ওই হাত– ও হাত যে একবার দেখেছে সে শুধু হাত দেখেই বুঝতে পারবে ওটা কাউন্ট ছাড়া অন্য কেউ নয়।

কাউন্ট ড্রাকুলার কাণ্ড দেখে তাজ্জব জোনাথন। ওটা কী করছে কাউন্ট? জানালা দিয়ে বেরিয়ে এলো সে, হামাগুড়ি দিয়ে নামছে। মুখটা প্রাসাদের দেয়ালে ফেরানো। বাতাসে ডানার মতো পতপত উড়ছে পরনের কালো আলখেল্লা। নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হতে চাইছে না জোনাথনের।

চাঁদের আলোয় ভুল দেখছি না তো। ভাবল ও। অনেক সময় চাঁদের আলো উদ্ভট ছায়া ফেলে।

না, চোখে ভুল দেখছে না জোনাথন হারকার। ওটা কাউন্ট ড্রাকুলাই। চার হাতপায়ে হামাগুড়ি দিয়ে জানালা বেয়ে নেমে এসেছে সে। এখন দেয়াল বেয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে টিকটিকির মতো!



ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে খুলে গেল কপাট

৩. রক্ত পিপাসা

এ ভয়ংকর জায়গাটা থেকে পালাতে হবে। প্রতিটি দরজা পরীক্ষা করে দেখল জোনাথন। সব কটা বাইরে থেকে বন্ধ। চাবি নিশ্চয় কাউন্টের

কাছে। চাবি জোগাড় করতে হলে ড্রাকুলার ঘরে যেতে হবে।

একটা দরজায় ধাক্কা মারতেই ওটার জং ধরা কবজা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে খুলে গেল কপাট। দরজার ওপাশে প্রাসাদের আরেকটা উইং বা অংশ। জোনাথন জানে এরকম সুযোগ আর আসবে না। ও পা টিপেটিপে অন্ধকারে কদম বাড়াল।

জায়গাটা বড্ড বেশি নীরব, সুনসান। কবরের মতো নিস্তব্ধতা জোনাথনের গায়ে কাঁটা দিল। তবু কাউন্টের কবল থেকে মুক্তি পেলেই হলো। একটা কাউচের ওপর বসে পড়ল জোনাথন, জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে। মায়াবী জোছনার আলোয় ভেসে যাচ্ছে প্রকৃতি। কী যে সুন্দর লাগছে দেখতে! হঠাৎ কাউন্টের সাবধানবাণী মনে পড়ে গেল জোনাথনের। সে পইপই করে বলে দিয়েছে নিজের ঘর ছাড়া যেন অন্য কোন ঘরে ঘুমোতে না যায় জোনাথন।

আমি ওর কথা মানব না, সিদ্ধান্ত নিল জোনাথন। আমার যেখানে খুশি শোব, তাতে কাউন্টের কী!

কাউচে বসে নাক ডাকতে লাগল জোনাথন। হঠাৎ নারীকণ্ঠের ফিসফিসানি শুনে জেগে গেল। দেখল তিন জন মহিলা ওকে ঘিরে বৃত্তাকারে ঘুরছে আর ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। দুই মহিলার গায়ের রং কালো, চোখে ড্রাকুলার মতো কলজে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেওয়া শ্যেন দৃষ্টি। তৃতীয় নারীর মাথাভর্তি সোনালি চুল, তার চোখ সবুজ, চকচকে। তাদের সবার ঠোঁট চুনিপাথরের মতো টকটকে লাল, দাঁত ঝকঝকে সাদা।

কালো মহিলা দুজন হাসতে হাসতে ফরসা মেয়েটিকে বলল, 'তুমি আগে যাও। তারপর আমরা আসছি। ও বয়সে তরুণ, শক্তিশালী, আমাদের তিনজনের তৃষ্ণা মেটানোর মতো যথেষ্ট রক্ত আছে ওর শরীরে।'

স্বর্ণকেশী মহিলা এগিয়ে গেল, ঝুঁকল জোনাথনের ওপর। গায়ে মেয়েটির নিঃশ্বাস পড়ছে। মিষ্টি তবে একই সঙ্গে কটুগন্ধী, পচা রক্তের মতো। আতঙ্কিত বোধ করল জোনাথন।


মায়াবী জোছনার আলোয় ভেসে যাচ্ছে প্রকৃতি

হঠাৎ ঘরে ঢুকল কাউন্ট! হাত বাড়িয়ে ফরসা মহিলার ঘাড় চেপে ধরল। রাগে জ্বলছে চোখ, দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে দাঁত। মেয়েটাকে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে ঘরের কোণে, অপর দুজনকে হাত ইশারায় পিছিয়ে যেতে বলল।

‘ওকে স্পর্শ করিস এত সাহস তোদের’, গাঁকগাঁক করছে কাউন্ট।

‘এ লোকটা আমার! নে, এগুলো নিয়ে সন্তুষ্ট থাক!’

সে একটা ব্যাগ ছুঁড়ে দিল মেঝেতে। ব্যাগের ভেতরে জ্যান্ত কিছু একটা নড়েচড়ে উঠল। এক মহিলা ছুটে গেল ব্যাগ খুলতে। থলের ভেতর থেকে শিশুকণ্ঠের কান্নার আওয়াজ ভেসে এলো। অন্য মহিলা দুজন থলেটাকে ঘিরে দাঁড়াল। তারপর চাঁদের আলোয় হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘটনার ভয়াবহতা সহ্য হলো না জোনাথনের। জ্ঞান হারাল ও।

পরদিন সকালে জোনাথন ঘুম ভেঙে দেখে সে নিজের বিছানায় শুয়ে আছে। গতকালের ঘটনা মনে পড়ে গেল। তাহলে কি গোটা ব্যাপারটা স্বপ্ন ছিল? না, এ স্বপ্ন হতে পারে না। ও জানে প্রাসাদের মধ্যে তিন জন মহিলা আছে যারা রক্ততৃষ্ণায় অস্থির, জোনাথনের রক্ত খাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে।

সে রাতে কাউন্ট জোনাথনকে তিনটি চিঠি লিখতে বলল। জোনাথনের বন্ধু-বান্ধবকে লিখতে হবে চিঠিগুলো।

‘প্রথম চিঠিতে লিখবেন আপনার কাজ প্রায় শেষ। দ্বিতীয়টিতে জানাবেন আপনি বাড়ির উদ্দেশে রওনা হচ্ছেন এবং তৃতীয় চিঠিতে থাকবে আপনি প্রাসাদ ছেড়েছেন এবং যাত্রাপথে রয়েছেন।’

কাউন্টের হুকুম মেনে চলা ছাড়া উপায় নেই জোনাথনের। চিঠিতে তারিখ দিতে হবে যথাক্রমে জুন ১২, জুন ১৯ এবং জুন ২৯। জোনাথন বুঝতে পারছে ওর আয়ু আর বেশিদিন নেই। ওর বাঁচার আশা শেষ।

ওর বর্তমান অবস্থার কথা যেভাবেই হোক জানাতে হবে বাইরের দুনিয়াকে। কয়েকদিন পরে, প্রাসাদের বাইরে একদল জিপসিকে দেখতে পেল জোনাথন। ওদের কাছে যদি একটা চিঠি দেওয়া যায় তাহলে ভয়ানক কিছু ঘটে যাবার আগেই বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগের একটা সুযোগ পাবে জোনাথন।

জোনাথন সিদ্ধান্ত নিল ও ওর বাগদত্তা মিনাকে শর্টহ্যান্ডে চিঠি লিখবে। ওই চিঠির অর্থ মিনা ছাড়া অন্য কেউ উদ্ধার করতে পারবে না। মি. হকিন্সকেও একটা চিঠি লিখবে ও, মিনার খোঁজ খবর নিতে বলবে।

চিঠিগুলো লিখে, একটা স্বর্ণমুদ্রাসহ ওগুলো জানালা দিয়ে নিচে, জিপসিদের কাছে ছুঁড়ে ফেলল জোনাথন। ওরা চিঠি এবং স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করল। যেন কী করতে হবে জানে। যাক, তবু একটা আশা আছে।

পরদিন জোনাথনের ঘরে এল কাউন্ট।

'জিপসিরা এ চিঠিগুলো আমাকে দিয়েছে,' বলল সে। 'একটা চিঠি আপনি লিখেছেন মি. হকিন্সকে। বেশ। এটা পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তবে অন্য চিঠিটিতে আপনি যা লিখেছেন তা আমার মনঃপুত হয় নি। এটা আমি রাখছি না।'

সে ওই চিঠিটি আগুনে ছুড়ে ফেলে দিল।

ওইদিন কয়েকজন লোক এলো প্রাসাদে। কিছু জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছে। জোনাথন ছুটে গেল জানালায়, লোকগুলোকে ডাকাডাকি করতে লাগল। ওরা ইংরেজি বোঝে না। জোনাথনের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন সে একটা পাগল। একজন তার সঙ্গীদেরকে কী যেন বলল। তারা হো হো করে হেসে উঠল। জোনাথন দেখল লোকগুলো ঘোড়ার গাড়ি থেকে কাঠের কতগুলো বড় বড় বাক্স নামাচ্ছে। বাক্সগুলোর হাতল রশি দিয়ে তৈরি।

সে রাতে জোনাথন আবার দেখল ড্রাকুলা টিকটিকির মতো বুকে হেঁটে প্রাসাদের দেয়াল বেয়ে নেমে যাচ্ছে নিচে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে কাউন্টের ফিরে আসার শব্দ পেল জোনাথন। ঠিক ওই মুহূর্তে প্রাসাদের উঠোন থেকে ভেসে এল তীব্র আর্তচিৎকার। এক মহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছে উঠোনে। জোনাথনকে জানালায় দেখতে পেয়ে সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'দানব! আমার বাচ্চাকে ফিরিয়ে দে!'

প্রকাণ্ড দরজায় ছুটে গেল সে, ঘুঁষি মারতে লাগল কপাটে। জোনাথন শুনতে পেল মহিলাকে কড়া গলায় ধমক দিচ্ছে কাউন্ট।



চিঠিটা আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে

হঠাৎ একপাল নেকড়ে এসে হাজির হয়ে গেল উঠোনে। মহিলা জানোয়ারগুলোকে দেখে ভয়ে চিৎকার করারও সময় পেল না, তার আগেই ওরা মহিলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত পরে ওখান থেকে চলে গেল নেকড়ের দল, রক্তাক্ত ঠোঁট চাটতে চাটতে।

পরদিন পালাবার পরিকল্পনা করল জোনাথন। মস্ত একটা ঝুঁকি নিল সে। খুলে ফেলল পায়ের জুতো, প্রাসাদের দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা পাথরের সরু একটা তাকে নেমে পড়ল। নিচের দিকে তাকাচ্ছে না ও, সরু তাকটা বেয়ে পৌঁছে গেল কাউন্ট ড্রাকুলার ঘরে।

ঘর খালি। তবে ওখানে কোনো চাবি পেল না জোনাথন, শুধু স্বর্ণের স্তূপ আর বিভিন্ন দেশের কাঁড়িকাঁড়ি টাকা। একটা দরজা চোখে পড়ল জোনাথনের। দরজার ওপাশে পাথরের একটি প্যাসেজওয়ে। গুহার মতো প্যাসেজটা গিয়ে শেষ হয়েছে একটি চ্যাপেলের ধ্বংসাবশেষে। চ্যাপেলের ভেতরে উৎকট গন্ধ। বমি এসে যায়।

চ্যাপেলের মেঝেয় সেই কাঠের বাক্সগুলো দেখতে পেল জোনাথন। বেশির ভাগের মধ্যে মাটি ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু একটির ভেতরে মাটির ওপরে শুয়ে আছে কাউন্ট ড্রাকুলা! হয় সে মারা গেছে নতুবা ঘুমোচ্ছে। চোখ খোলা তবে শ্বাস নিচ্ছে না কিংবা হৃৎস্পন্দনও তার নেই। খোলা চোখে তীব্র শয়তানি চাউনি, ওদিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না জোনাথন। সভয়ে পিছিয়ে এলো। তারপর ফিরে এলো নিজের ঘরে।

দেখতে দেখতে চলে এলো ২৯ জুন।

'আগামীকাল আমরা একে অন্যের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব, বন্ধু,' ঘরে ঢুকে বলল কাউন্ট। 'আপনি ফিরে যাবেন ইংল্যান্ডে, আপনার সুন্দর দেশে। আশা করি ক্যাসল ড্রাকুলায় আবার আপনার দেখা পাব।'

'আজ রাতে যেতে পারলে ক্ষতি কী?' কাউন্টকে একটু বাজিয়ে দেখতে বলল জোনাথন।

'সে আপনার ইচ্ছে,' বলল কাউন্ট।

জোনাথন দ্রুত পা বাড়াল সদর দরজায়। অবাক হয়ে দেখল দরজায় তালা মারা নেই। ও ধাক্কা মেরে দরজা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে কানে ভেসে এল নেকড়ের গর্জন। একযোগে ছুটে আসছে দরজার দিকে, হাঁ করা মুখে ঝকঝক করছে ধারালো দাঁতের সারি।

জোনাথন বুঝতে পারল কাউন্টকে বুদ্ধির খেলায় হারানো তার কম্ম নয়। কাল সকাল পর্যন্ত ওকে অপেক্ষা করতেই হবে।



জোনাথন সেই সরু পাথুরে তাক বেয়ে ঢুকে পড়ল ড্রাকুলার ঘরে

পরদিন জোনাথন আবার সেই সরু পাথুরে তাক বেয়ে ঢুকে পড়ল ড্রাকুলার ঘরে। চলে এলো ভগ্ন চ্যাপেলে। ড্রাকুলা তার কাঠের বাক্সে শুয়ে আছে। তবে বয়স যেন অনেকটাই কমে গেছে তার, বিবর্ণ ত্বক তাজা দেখাচ্ছে।

এই সৃষ্টিছাড়া জীবটাকে কি-না আমি লন্ডনে নিয়ে যেতে সাহায্য করছি, ভাবছে জোনাথন। ওখানে তার রক্তপিপাসা মেটানোর মতো মানুষের অভাব হবে না।

আতংকিত জোনাথন একটা বেলচা তুলে নিয়ে বাড়ি মারল কাউন্টের ভয়ংকর মুখে। কাউন্টের চোখজোড়া এমন ভয়ানক জ্বলে উঠল, ভয় পেয়ে লক্ষচ্যুত হলো জোনাথন। বেলচা বাড়ি খেল পিশাচটার কপালে। সঙ্গে সঙ্গে বাক্সের ঢাকনি বন্ধ হয়ে গেল।

জোনাথন এক দৌড়ে ফিরে এলো কাউন্টের ঘরে। নিচতলায় শুনতে পেল দরজা খোলার আওয়াজ। জিপসিরা এসেছে বাক্সগুলো নিয়ে যেতে। পেরেক ঠুকে তারা বাক্সের ডালা বন্ধ করল। মেঝেয় ভারী পায়ের শব্দ তুলে কিছুক্ষণ পরে ওরা চলে গেল।

এই ভয়ংকর প্রাসাদে ঐ ভয়ানক মহিলাগুলোর সঙ্গে আমি এখন একা। শিউরে উঠল জোনাথন।

ওকে পালাতে হবে। জানালায় ছুটে এলো ও। এখানে আর এক মুহূর্তও নয়। এবারে ওই সরু তাক বেয়ে যেভাবেই হোক পালাবার একটা রাস্তা খুঁজে বের করতেই হবে। নতুবা মরণও ভালো!

বিদায়, মিনা! প্রেমিকার উদ্দেশ্যে মনেমনে বলল জোনাথন, তারপর পা রাখল সরু, পাথুরে তাকে।



মিনা জোনাথনের লেখা চিঠি পেয়েছে

৪. রেনফিল্ডের পাগলামি

মিনা মুরের কল্পনাতেও নেই যে মানুষটাকে সে ভালোবাসে, সেই লোকটি কাউন্ট ড্রাকুলার প্রাসাদে বন্দি হয়ে আছে। মিনা কিছুদিন আগে

জোনাথনের লেখা চিঠি পেয়েছে। জোনাথন লিখেছে সে শিগগিরই ট্রানসিলভানিয়া থেকে রওনা হচ্ছে। অধীর আগ্রহে প্রেমিকের ফেরার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে মিনা। জোনাথন কোন কোন জায়গায় ঘুরেছে, কী কী দেখেছে তা জানার আর তর সইছে না ওর।

কয়েকদিন পরে মিনা সিদ্ধান্ত নিল তার বান্ধবী লুসি ওয়েস্টেনরার বাড়ি বেড়িয়ে আসবে। তাই চলল লুসির সঙ্গে দেখা করতে। লুসি এবং তার মা হুইটবিতে এসেছে গরমের ছুটি কাটাতে। জায়গাটা সাগরতীরে। মিনা একটি স্কুলের সহকারী শিক্ষিকা।

রেলরোড স্টেশনে সাক্ষাৎ হলো দুজনের। ওরা বাল্যবন্ধু। সেই ছোট্টবেলা থেকে দুটিতে দারুণ সখ্য। লুসির ঝলমলে চেহারা দেখেই মিনা বুঝে ফেলল প্রিয় বান্ধবীটি বিশেষ কোনো খবর বলার জন্যে ছটফট করছে।

'তোমার কাছে তো কোনো কথা কোনোদিন গোপন করি নি,' বলল লুসি। 'তুমিও সবকথা বলেছ আমাকে অকপটে। একটা কথা বলব তোমাকে। না বলা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না।'

মিনাকে আগে ওদের ঘরটা দেখাল লুসি। এ ঘরেই থাকবে দুজনে।

'চলো, তোমাকে আমার পছন্দের একটা জায়গায় নিয়ে যাই,' বলল লুসি।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে একটা পাহাড়ে চলে এল। পাহাড়ের কোলে প্রাচীন একটি গির্জা, হুইটবি অ্যাবি। গির্জার নিচে বিশাল এক গোরস্তান।

'আমি এখানে প্রায়ই আসি,' জানাল লুসি। 'এখান থেকে জেটি দেখা যায় পরিষ্কার। জায়গাটা খুব সুন্দর, না?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ওর কথায় সায় দিল মিনা। হ্যাঁ, সত্যি সুন্দর জায়গা। একটি সমাধিস্তম্ভের ওপরে বসল দুই বান্ধবী।

'লুসি,' বলল মিনা, 'আমাকে আর রহস্যের মধ্যে রেখ না, ভাই।'

'ভাবতে পার,' ফিসফিস করল লুসি, 'তিন তিনটা বিয়ের প্রস্তাব এসেছে



একটি সমাধিক্ষেত্রের ওপরে বসল দুই বান্ধবী

আমার কাছে। কুড়িতে পড়তে যাচ্ছি, এতদিন কেউ কোনো প্রস্তাব দিল না। আর এখন কি-না হঠাৎ করে একসঙ্গে তিনটি প্রস্তাব! আর যারা আমাকে বিয়ে করতে চাইছে তারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত সুদর্শন।'

'তুমি দারুন ভাগ্যবতী,' বলল মিনা। 'ওরা কারা?'

'প্রথম পাত্রটির নাম ড. জন সেওয়ার্ড। সে লন্ডনে একটি পাগলাগারদ চালায়। ওটা কারফ্যাক্স এস্টেটের কাছে। অত্যন্ত বুদ্ধিমান, খুব দয়ালু এবং সমঝদার একজন মানুষ। তাকে ফিরিয়ে দিতে আমার খুব খারাপ লেগেছে। ডাক্তার জিজ্ঞেস করেছিল আমার জীবনে অন্য কেউ আছে কি না। আমি বলেছি হ্যাঁ।'

'তোমার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে মানুষটা খুব ভালো।'

'হ্যাঁ, দ্বিতীয় পাত্রটিও কম ভালো নয়। তার নাম কুইন্সি মরিস। আমেরিকান। খুব রসিক আর দিলখোলা স্বভাবের মানুষ। আমি যখন বললাম ওকে বিয়ে করতে পারছি না ও জবাবে কী বলল জানো? বলল, সে সারাজীবন আমার বিশ্বস্ত বন্ধু হয়ে থাকতে চায়। দারুণ, না?'

'খুবই দারুণ। আচ্ছা, এবারে তৃতীয় পাত্রটির কথা শুনি। এ মানুষটাকে নিশ্চয় তোমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে।'

'ও অন্যদের মতো আমাকে প্রস্তাব দেয় নি। ও কী বলবে ভেবেই পাচ্ছিল না, আমিও তাই। হঠাৎ দেখি সে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে। ওর নাম আর্থার হোমউড। দারুণ সুদর্শন, চমৎকার হাসিখুশি একজন মানুষ। একজন মেয়ে একটি পুরুষের কাছে যা যা চায়, সবই আছে ওর মধ্যে। আমি ওকে ভালোবেসে ফেলেছি, মিনা। আমি ওকে হ্যাঁ বলে দিয়েছি।'

'বাহ্, চমৎকার,' বলল মিনা। 'ওর সঙ্গে কবে আমার আলাপ করিয়ে দিচ্ছ?'

'পারলে তো এখুনি দিতাম। কিন্তু বেচারার বাবা অসুস্থ। তাই বাড়ি গেছে। আশা করি শিগগিরই ফিরবে।'

লুসির কথা শুনে জোনাথনকে মনে পড়ে গেল মিনার। ওর অনুপস্থিতি ভীষণ কষ্ট দিচ্ছে মিনাকে। মনে মনে প্রার্থনা করল শিগগিরই যেন বাড়ি ফিরে আসে জোনাথন। কিন্তু কতদিন হয়ে গেল এখনও দেখা নেই জোনাথনের। খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে মিনার।

গির্জা বা মঠে এসে গল্পগুজব করা দুই বান্ধবীর একটা রুটিনে দাঁড়িয়ে গেল। ওরা প্রতিদিন এখানে আসে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে কিংবা বই পড়ে সময় কাটিয়ে দেয়।

নিজের বিয়ে নিয়ে পরিকল্পনার শেষ নেই লুসির। গ্রীষ্মের শেষে ওর বিয়ে। সেই উত্তেজনায় অস্থির। লুসির ছোটবেলা থেকে একটা অভ্যাস আছে রাতের বেলা ঘুমের ঘোরে হেঁটে বেড়ায়। অভ্যাসটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। লুসির মা আর মিনা মিলে সিদ্ধান্ত নিল রাতের বেলা লুসির ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখা হবে, যাতে সে ঘুমের ঘোরে বাইরে যেতে না পারে।

কিন্তু প্রায় প্রতি রাতেই ঘুমের ঘোরে বাইরে যাবার চেষ্টা করে লুসি। দরজায় তালা মারা দেখে সে চাবি খুঁজতে থাকে।

লুসি এবং মিনা ওদের প্রেমিকরা কবে বাড়ি ফিরবে সেজন্যে অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিল। যতদিন যাচ্ছিল ততই যেন অস্থির হয়ে উঠছিল দুজনে। একদিন বিকেলে লুসির অস্থিরতা সাংঘাতিক বেড়ে গেল। মিনা ভাবল ঝড় আসছে বলে হয়তো লুসি দুশ্চিন্তা করছে। বিরাট বিরাট ঢেউ উঠেছে সাগরে।

'ঝড় আসার আগেই মাছধরার নৌকাগুলো সব জেটিতে ফিরে আসবে,' বলল মিনা।

'কিন্তু ওই জাহাজটা?' হাত তুলে দেখাল লুসি।

কুয়াশা ভেদ করে মিনা দেখতে পেল প্রকাণ্ড একটি জাহাজ ঢেউয়ে দোল খেতে খেতে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ছুটে চলেছে। যেন ওটার হাল ধরার কেউ নেই। জাহাজটা কি জেটিতে যাচ্ছে নাকি ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা করছে! ভাবছে মিনা। বাতাসের বেগ আরও বেড়ে গেলে জাহাজটা পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে ডুবে যেতে পারে।

জাহাজটা যেভাবে চলছে ওভাবে কেউ কোনোদিন জাহাজ চলতে দেখেনি। ওটার মধ্যে রহস্যময় এবং অদ্ভুত কী যেন একটা আছে।

এদিকে লুসির পানি প্রার্থী, ডা. জন সেওয়ার্ড নিজের কাজে যোগ



হাত তুলে জাহাজটা দেখাল লুসি

দিয়েছে। এক অদ্ভুত রোগীর চিকিৎসা করছে সে। রোগীর পেছনেই তার কর্মঘণ্টার বেশিরভাগ সময় ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। এতে অবশ্য অখুশি নয় ডাক্তার। কারণ সময় কাটানোর একটা উপায় তো পাওয়া গেছে। লুসির প্রত্যাখ্যানে ভীষণ মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল ডাক্তারের। লুসি বলেছে সে



রেনফিল্ডের শখ হলো মাছি ধরা

আরেকজনকে ভালোবাসে। মন খারাপ বলে কর্তব্যে অবহেলা করবে, এমন মানুষই নয় ডা. জন সেওয়ার্ড।

তার রোগীর নাম রেনফিল্ড। বয়স ৫৯, পেশিবহুল শরীর। লোকটা

সবসময় গম্ভীর হয়ে থাকে। রেনফিল্ডের পাগলামিটা সত্যি অদ্ভুত ধরনের।

মাঝে মাঝে একদম স্বাভাবিক মনে হয় তাকে। সে জীবজন্তু ভালোবাসে। তার শখ হলো মাছি ধরা। ডা. সেওয়ার্ড মাছি ধরতে মানা করার পরে সে মাকড়সা ধরতে শুরু করে। যে মাছিগুলো ধরে জমিয়ে রেখেছিল রেনফিল্ড, ওগুলো সে তার মাকড়সাদের খেতে দেয়।

'মাছির ব্যাপারে তোমার এত আগ্রহের কারণ কী?' জিজ্ঞেস করল ডাক্তার।

'কারণ?' বলল রেনফিল্ড, 'কারণ মাছি আমাকে সবল জীবনের সন্ধান দেয়।'

ডা. সেওয়ার্ডের সামনেই রেনফিল্ড বড়-সড় একটা ডুমো মাছি খপ করে ধরে, মুখে পুরে, কচরমচর করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল।

কয়েকদিন পরে রেনফিল্ডের ধরা মাকড়সার সংখ্যা কমতে লাগল। এখন চড়ুই পাখি ধরার নেশায় তাকে পেয়েছে। চড়ুইগুলিকে সে মাকড়সা খেতে দেয়।

'এরপরে আমি বেড়াল পুষব,' বলল রেনফিল্ড। 'ওটার সঙ্গে খেলা করব এবং ওকে খাইয়ে দেব।'

ডাক্তার জানিয়ে দিল পাগলাগারদে বেড়াল পোষার নিয়ম নেই। পরদিন সে দেখল রেনফিল্ডের খাঁচার সবগুলো চড়ুইপাখি উধাও। ওর বিছানায় পড়ে আছে কিছু পালক আর বালিশে লেগে রয়েছে রক্ত।

'ও নির্ঘাত পাখিগুলোকে কাঁচা খেয়ে ফেলেছে,' মনে মনে বলল ডাক্তার। 'রেনফিল্ডের পাগলামির কারণ খতিয়ে দেখা দরকার। ওর এ রোগ কেন হলো জানতে হবে আমাকে। এরকম অদ্ভুত কেস জীবনে পাই নি আমি।'

৫. কফিনের পিশাচ

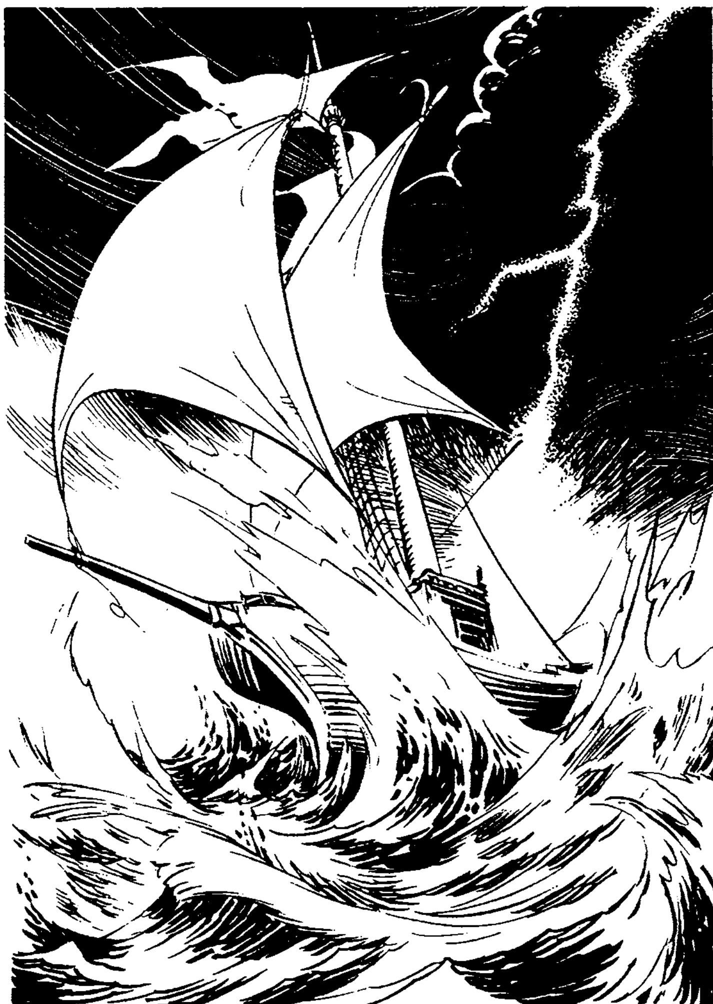
অস্ত যাচ্ছে সূর্য। হুইটবির পশ্চিমাকাশে বেগুনি, গোলাপি, সিঁদুররঙা আর সোনালি মেঘেরা মিলেমিশে দারুণ সুন্দর একটি দৃশ্যপট তৈরি করেছে। তবে আকাশের এক কোণে কালো যে মেঘগুলো দ্রুত জমা হচ্ছে, ওগুলো দেখলেই ভয় লাগে। ভয়ংকর এক ঝড়ের পূর্বাভাস নিয়ে আসছে কৃষ্ণ মেঘের সারি।

সন্ধ্যানাগাদ থেমে গেল বাতাস। আশ্চর্য শান্ত হয়ে গেছে উন্মাতাল হাওয়া, এখন লু হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সাগরে একটিও নৌকা নেই শুধু সেই রহস্যময় জাহাজটি ছাড়া।

'ওই জাহাজের নাবিকগুলো মাথাপাগলা,' বলাবলি করছে লোকে। 'ঝড় এলেই ডুবে যাবে জাহাজ।'

হঠাৎ বিস্ফোরিত হলো আকাশ। ঝড়ো হাওয়ার প্রচণ্ড একটা দাপট আকাশের বুক চিড়ে বেরিয়ে এলো। সাগরে পাহাড়সমান ঢেউ উঠল, হা হা করে দানবের মতো ছুটে গেল জেটি অভিমুখে। বজ্রের মতো হুংকার ছাড়ছে বাতাস। হাওয়ার বেগ এত বেশি, মানুষজন খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেও পারছে না। উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। ভৌতিক ছায়ার মতো ঘন কুয়াশার একটা বিশাল চাদর ঢেকে দিল চরাচর।

স্বল্প কয়েকটি জেলেনৌকা দূরে মাছ ধরতে গিয়েছিল। তারা ঝড়ের তাণ্ডব থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে ফিরে এসেছে জেটিতে। সাগরতীরে দাঁড়িয়ে যারা ঝড়ের রুদ্রমূর্তি দেখছিল, জেলেদের ফিরতে দেখে তারা খুশিতে হাততালি দিল। ঝড়ের কবলে পড়ে সেই বিরাটকৃতির জাহাজটির অবস্থা কাহিল। সাগরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ জাহাজটিকে নিয়ে ইচ্ছেমতো লোফালুফি করছে। ঢেউয়ের মাথায় চড়ে একবার উঠে



ঝড়ো হাওয়ার প্রচণ্ড একটা দাপট আকাশের বুক চিড়ে বেরিয়ে এলো

যাচ্ছে শূন্যে, পরক্ষণে সরসর করে নেমে আসছে পাতালে। ঢেউয়ের বাড়ি খেতে খেতে জলযানটি অনিবার্য গতিতে এগিয়ে চলেছে পাহাড়ের দিকে।

পর্বতসমান ঢেউগুলো একের পর এক আছড়ে পড়ছে জাহাজের গায়ে। অল্পের জন্যে একটা পাহাড়ের গায়ে বাড়ি খেল না জাহাজ, আরও একটা বিরাট পাথরখণ্ড এড়িয়ে যেতে পারল। তারপর, অলৌকিকভাবেই বলতে হবে, জাহাজটি জেটিতে ভিড়ল।

সার্চলাইট ফেলে খোঁজাখুঁজি চলল জাহাজে। জাহাজ এসে তীরে ঠেকেছে। বিশালদেহী এক কুকুর ডেক থেকে লাফিয়ে তীরে নামল। পাহাড়ের দিকের কবরস্থানে সোজা দৌড়াল সে।

সবাই ছুটে গেল জাহাজে। হুইলের সঙ্গে রশি বাঁধা অবস্থায় একটা লোক পড়ে আছে। মৃত। গোটা জাহাজে আর কেউ নেই। জাহাজটি যেন নিজে নিজেই জেটিতে চলে এসেছে।

'দেখো,' একজন ইঙ্গিত করল। 'ওর দুহাতের মধ্যে একটা ক্রুশ বাঁধা।'

'লোকটা কমপক্ষে দুদিন আগে মারা গেছে,' মন্তব্য করল আরেকজন।

জাহাজটি রুশ দেশের। নাম ডেমিটার। জাহাজের কার্গো বা মাল রাখার জায়গা বোঝাই হয়ে আছে অনেকগুলো কাঠের বাক্সে। বাক্সগুলোর ভেতরে কাদামাটি ছাড়া কিছু নেই। হুইটবির একজন আইনজীবী এলো বাক্সগুলোর মালিকানা বুঝে নিতে।

বিরাট আকারের কুকুরটিকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

'ওটা বোধ হয় ভয়ের চোটে জলায় পালিয়েছে,' বলল একজন।

হুইটবির পরিদর্শকরা জাহাজের লগবুক পড়ে দেখল। কারণ লগবুকে জাহাজের দৈনন্দিন সমস্ত কর্মকাণ্ডের কথা বিস্তারিত লেখা থাকে। লগবুকে লেখা, ডেমিটার রাশিয়া থেকে কৃষ্ণ সাগরে যাত্রা শুরু করে। জাহাজটি ইংল্যান্ডে আসছিল। যাত্রার শুরুতে সবকিছু স্বাভাবিকই ছিল।

যাত্রা করার দশ দিন পরে জাহাজের ক্যাপ্টেন একটি অদ্ভুত ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন।

'পেত্রোভস্কি নামে আমাদের এক নাবিককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না,' লিখেছেন তিনি।



লোকটা কমপক্ষে দুদিন আগে মারা গেছে

'অন্য জাহাজিদের ধারণা, জাহাজে ভয়ংকর কিছু একটা আছে।'

কয়েকদিন পরে এক নাবিক এলো ক্যাপ্টেনের কাছে। 'গতকাল রাতে, ঝড়বৃষ্টির সময় আমি এক আগন্তুককে ডেকে দেখেছি,' বলল সে।

'লোকটা খুব লম্বা এবং রোগা, তবে আমাদের কোনো নাবিক সে নয়। আমি তার পিছু নিয়েছিলাম। হঠাৎ করেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।'

নাবিকদের ভয় দূর করার জন্যে গোটা জাহাজ তল্লাশির হুকুম দিলেন ক্যাপ্টেন। জাহাজের প্রতিটি কোণ তারা খুঁজে দেখল। কিন্তু অচেনা কাউকে দেখতে পেল না।

পরের সপ্তাহে আরেক ঝামেলা। আরেক নাবিক জাহাজ থেকে উধাও। নাবিকরা সবাই দারুণ ভয় পেয়ে গেল। এর মধ্যে আবার শুরু হয়ে গেল ঝড়। ঝড়ের উন্মত্ততায় কেউ ঘুমোবার সুযোগ পেল না। জাহাজ যাতে ডুবে না যায় সে জন্যে সবাইকে ব্যস্ত থাকতে হলো।

ঝড় থামল। শান্ত হলো সাগর। কিন্তু রাতের বেলা আরও কয়েকজন নাবিক যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আতঙ্কে বাকি নাবিকদের আত্মা উড়ে যাবার জোগাড়।

ওরা ইংল্যান্ডের কাছাকাছি এসে পড়েছে, কিন্তু জাহাজে লোক আছে মাত্র চারজন। এত স্বল্পসংখ্যক লোকবল দিয়ে পাল তোলা বা নামানোর উপায় নেই। হাল ছেড়ে দিল তারা। ভরসা এখন বাতাসের ওপর। বাতাস যেদিকে খুশি টেনে নিয়ে যাক জাহাজ, করার কিছু নেই। এদিকে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা-র মতো ঝপ করে নেমে এসেছে কুয়াশা। ঘন কুয়াশার মাঝ দিয়ে দুইদিন একটানা চলতে লাগল জাহাজ। জাহাজের যাত্রীরা জানে না কোথায় চলেছে তারা।

'এক রাতে,' লিখেছেন ক্যাপ্টেন, 'আমি ডেকে এলাম জাহাজ চালাতে। যে লোকটি এতক্ষণ জাহাজ চালাচ্ছিল তাকে দেখতে পেলাম না কোথাও। শুধু সে নয়, জাহাজে আর একজন নাবিকও নেই। আমি হুইল ধরলাম। ডাক দিলাম আমার মেটকে।

আমার ডাক শুনে মেট এলো। চোখে উন্মাদের দৃষ্টি। ওটা এখানে আছে, ক্যাপ্টেন– বলল সে। আমি গতরাতে ওটাকে দেখেছি। মানুষের মতো দেখতে। ভৌতিক চেহারা। আমি ওটার গায়ে ছুরি চালিয়েছিলাম। কিন্তু ছুরিটা তার শরীরে এমনভাবে ঢুকে গেল যেন সে বাতাস দিয়ে তৈরি।'



ক্যাপ্টেনকে যথাযোগ্য মর্যাদায় কবর দেওয়া হলো

'মেট বদ্ধ উন্মাদ বনে গেছে', লিখেছেন ক্যাপ্টেন, মেট নিচে চলে যাবার পরে ক্যাপ্টেন লিখেছেন, 'ওই বাক্সগুলোর মধ্যে নিশ্চয় কিছু আছে। আমি সবগুলো বাক্স খুলে দেখব। ওখানেই কোথাও লুকিয়েছে ওটা।'

ক্যাপ্টেন শুনতে পেলেন ডেকের নিচে কে যেন ঠকঠক শব্দ করছে। ঠকঠক শব্দটা চলল কিছুক্ষণ। অকস্মাৎ তীব্র একটা চিৎকারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল বাতাস। মেট চিৎকার করতে করতে ছুটে এসেছে ডেকে, 'আমাকে বাঁচান!' ক্যাপ্টেন তাকে ধরার আগেই সে, 'আমি এখন গোপন রহস্যটা জানি!' বলেই লাফিয়ে পড়ল সাগরে।

'গোপন রহস্যটা আমিও জানি' লগবুকের শেষ পাতায় লিখেছেন ক্যাপ্টেন।

গত রাতে আমিও ওটাকে দেখেছি। মেটের মতো আমারও সাগরে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ক্যাপ্টেন হিসেবে আমি জাহাজ ছেড়ে কোথাও যেতে পারি না। আমি হাতে একটি ক্রুশ বেঁধে নেব। তাহলে ওই পিশাচটা আমাকে স্পর্শ করার সাহস পাবে না। আমার শরীর ক্রমে দুর্বল হয়ে আসছে। রাত ঘনাচ্ছে। ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন...'

লগবুকে আর কিছু লেখা নেই। কিসের ভয়ে সবাই ভীত ছিল তা কেউই পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারল না। তবে ক্যাপ্টেনকে যথাযোগ্য মর্যাদায় কবর দেওয়া হলো। এই অদ্ভুত যাত্রার শেষ সাক্ষী সেই বিশালদেহী কুকুরটিকে আর কেউ কোনদিন দেখতে পায় নি। শহরের লোকেরা জানত রহস্যময় এই সমুদ্রযাত্রার রহস্য তারা কোনোদিন ভেদ করতে পারবে না।

৬. নিশির ডাক

পরদিন মিনা এবং লুসি দেখতে গেল ঝড়ে জেটি বা পোতাশ্রয়ের কতটা ক্ষতি হয়েছে। সূর্যালোকিত ঝকঝকে একটি দিন। কিন্তু সাগরের দাপাদাপি এখনও কমে নি। বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ছে বালুকাবেলায়। ভয়ানক এ ঝড়ের সময় জোনাথন সমুদ্রযাত্রা করে নি ভেবে মনে মনে স্বস্তি পেল মিনা। কিন্তু কোথায় সে? ও ভালো আছে তো? চিঠি লিখছে না কেন সে মিনাকে?

ভুতুড়ে রুশ জাহাজের ক্যাপ্টেনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ওরা যোগ দিল। গোরস্তানে যে জায়গাটায় বসে মিনা এবং লুসি বসে গল্প করে, তার অনতিদূরে কবর দেওয়া হলো ক্যাপ্টেনকে।

জাহাজের ভৌতিক ঘটনা না আবার লুসিকে দুঃস্বপ্ন দেখাতে শুরু করে ভেবে চিন্তায় পড়ে গেল মিনা। কারণ মেয়েটিকে কেমন অস্থির লাগছে।

লিসার মন থেকে যাবতীয় অস্থিরতা দূর করে দিতে মিনা বলল, আজ ওরা অনেকখানি রাস্তা হাঁটাহাঁটি করবে।

'চলো রবিন হুড-স বে-তে যাই,' প্রস্তাব দিল মিনা। 'ওখানে তোমার ভালোই লাগবে। আর অনেকটা রাস্তা হাঁটার ক্লান্তিতে রাতে ঘুমও হবে ভালো।'

সাগরতীর ধরে হাঁটতে লাগল দুই বান্ধবী। বুক ভরে নিল সাগরের নোনা ধরা তাজা বাতাস। হুইটবিতে ফেরার আগে একটা সরাইখানায় ঢুকে পেট পুরে খেল ওরা। যখন বাড়ি ফিরল, ক্লান্তিতে দারুণ ঘুম এসে গেছে ওদের। চোখ মেলেই রাখতে পারছিল না। লুসি যে ভ্রমণটা বেশ উপভোগ করেছে, তা ওর চেহারা দেখেই বোঝা যায়। গালে গোলাপি রঙের ছোপ লেগেছে। ও সোজা ঘুমোতে গেল। স্বস্তি বোধ করল মিনা। যাক, আজ রাতে আশা করা যায় লুসি অদ্ভুত কোনো কাণ্ড ঘটাবে না।



সাগরের দাপাদাপি এখনও কমেনি

মাঝরাতে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে ঘুম থেকে জেগে গেল মিনা। ঘর এমন অন্ধকারে ডুবে আছে, বিছানা ঠাহর করা যাচ্ছে না। ও পা টিপে টিপে লুসির খাটের ধারে গেল। হাতড়াল বিছানা। শূন্য। একটা দেশলাই জ্বালাল মিনা। তাকাল চারদিকে। নেই লুসি।

মিনা লুসির অসুস্থ মাকে আর ঘুম থেকে জাগাল না। ঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে মনে মনে বলল, 'শুধু নৈশ পোশাক পরে ও নিশ্চয় বেশি দূরে যায় নি। হয়তো নিচতলায় গেছে।'

বসার ঘরে গেল মিনা। নাহ্, এখানেও নেই লুসি। দেখল সদর দরজা ভেজানো। স্রেফ একটা নৈশ পোশাক পরে এত রাতে লুসি বাইরে হাঁটাহাঁটি করছে ভাবতেই শরীরে কাঁপুনি ধরে গেল মিনার। ও দ্রুত ভারী একটা শাল পেঁচাল গায়ে, তারপর বেরিয়ে পড়ল দরজা খুলে।

ঢং ঢং শব্দে ১টা বাজার ঘোষণা দিল ঘড়ি। আশপাশের চৌহদ্দির মধ্যে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ঝলমলে একখানা চাঁদ অকাতরে আলো বিলোচ্ছে শহরের বুকে। তবে বাতাসে ভেসে আসা কালো মেঘ মাঝে মাঝে গ্রাস করছে রুপোলি চাঁদ, আঁধারে ঢেকে দিচ্ছে সবকিছু।

পাহাড়ের ওপরে, গোরস্তানে, মিনা এবং লুসি যেখানে বসে নিত্যদিন গল্প করে, ওখানটাতে সাদা একটা শরীর চাঁদের আলো গায়ে মেখে শুয়ে রয়েছে। একটা কালো মেঘ ঢেকে দিয়েছে চাঁদ, ছায়া পড়েছে প্রকৃতির বুকে, মিনা দেখল কালোমতো কী যেন একটা ঝুঁকে পড়েছে সাদা শরীরটার উপর। ওটা মানুষ নাকি পশু ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

মিনা যত জোরে সম্ভব ছুটল। গোটা শহর নীরব, নিস্তব্ধ, ঘুমে কাতর। মিনা দৌড়াচ্ছে তো দৌড়াচ্ছেই। দূরত্ব যেন সীমাহীন, ফুরোতে চায় না পথ। মিনার মনে হলো এ জনমে সে কবরস্থানে পৌঁছতে পারবে না।

ছুটতে ছুটতে অবশেষে গোরস্তানের কাছাকাছি চলে এল ও। হ্যাঁ, ঠিকই অনুমান করেছে মিনা। সমাধিস্তম্ভের ওপর শুয়ে থাকা সাদা শরীরটা লুসিরই। আর ওর ওপর কুচকুচে কালো সেই প্রাণীটা এখনও ঝুঁকে রয়েছে।

'লুসি!' গলা ফাটাল মিনা। 'ওহ্, লুসি!'

কালো কাঠামোটা মুখ তুলল। মিনা ওটার মরা মানুষের মতো সাদা মুখ দেখতে পেল। চোখ জোড়া লাল টকটকে। অঙ্গারের মতো জ্বলছে। মিনা গির্জা ঘুরে চলে এলো গোরস্তানের ফটকে। লুসি এখনও শুয়ে আছে


কালো কাঠামোটা মুখ তুলল

পাথরের সমাধিস্তম্ভের ওপর। তবে সেই বিকট জিনিসটা অদৃশ্য। আশপাশে কাউকে দেখতে পেল না মিনা।

ঘুমোচ্ছে লুসি। থেমে থেমে শ্বাস নিচ্ছে। যেন খিঁচুনি উঠে গেছে শরীরে। মিনা লুসির নৈশ-পোশাকের গলার কাছে হাত দিয়ে আঁতকে উঠল।

বরফের মতো ঠাণ্ডা লুসির গা। ও এভাবে আর কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলে ঠাণ্ডায় জমে যাবে। মিনা গায়ের গরম শালটা খুলে লুসির শরীরে ভালোভাবে জড়িয়ে দিল। শাল যাতে খুলে না যায় সেজন্য একটা সেফটি পিন দিয়ে আটকে দিল শাল। সেফটি পিন লাগানোর সময় বোধহয় খোঁচা খেয়েছে লুসি, কাতরে উঠে গলায় হাত দিল।

মিনা নিজের জুতো খুলে পরিয়ে দিল লুসিকে। মিনার পা কাদায় মাখামাখি। দূর থেকে দেখলে মনে হবে ও-ও জুতো পরে আছে। লুসির একটা হাত নিজের কাঁধে তুলে নিল মিনা। বাড়ি ফেরার পথে ওর গায়ে ঝুলে ঝুলে হাঁটতে লাগল ঘুমন্ত লুসি। তবে একটু পরেই জেগে গেল ও। ভাবল ঘুমের ঘোরে হাঁটতে হাঁটতে এতদূরে এসে পড়েছে। মিনতি করল যেন এ ঘটনা মিনা কাউকে না বলে, এমনকি ওর মাকেও না।

'দুর্বল হার্টের মানুষ আমার মা,' বলল লুসি। 'এ ঘটনা শুনলে হয়তো হার্টফেল করেই মারা যাবেন।'

লুসির আজকের নিশি পাওয়ার গল্প কাউকে বলবে না, জানাল মিনা।

বাড়ি ফিরে লুসি আবার ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন মিনা ওকে না জাগানো পর্যন্ত ঘুমিয়েই রইল। গত রাতের ঘটনা ওর ওপর নেতিবাচক কোন প্রভাব ফেলে নি বরং লুসিকে আরও বেশি প্রাণবন্ত লাগল। মিনা লক্ষ্য করল সেফটি পিনের গুঁতোয় লুসির গলায় দুটো লালচে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। বান্ধবীর নৈশ-পোশাকের কলারে রক্তের ফোঁটাও তার চোখ এড়াল না। অসাবধানে পিন ফুটিয়ে ফেলেছে, মিনা ক্ষমা চাইলে হেসে উঠল লুসি। বলল সে টেরও পায় নি।

তবে লুসির নিশি পাওয়া অর্থাৎ রাতের বেলা ঘুমের ঘোরে হাঁটাহাঁটির অভ্যাস কিন্তু দূর হলো না। মিনা এখন শুধু দরজায় তালা মেরেই রাখে না চাবিটি কবজিতে সুতোয় বেঁধে রাখে যাতে লুসি কোনভাবেই বাইরে যেতে না পারে। এক রাতে ঘুম ভেঙে সে দেখে লুসি বিছানায় বসে আছে, জানালার বাইরে কী যেন দেখাচ্ছে আঙুল তুলে।

'ওটা একটা বাদুড়,' বলল মিনা। জানালার বাইরে প্রকাণ্ড, কালো একটা


লুসির গলায় দুটো লালচে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে

বাদুড় ডানা ছটফটাচ্ছে। ওটা জানালার কাচের কাছে এসে খানিকক্ষণ ডানা ঝাপটাল তারপর পাখা মেলে উড়ে গেল বিধ্বস্ত মঠ এবং ওটার পাশের গোরস্তানের দিকে।

আরেকদিন, ক্লান্ত লুসি তাড়াতাড়ি ঘুমাতে গেছে, মিনা চাঁদের আলোয় কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করতে বেরোল। বাড়ি ফেরার পথে দেখল লুসি জানালায় হেলান দিয়ে আছে। মিনা লুসির দিকে ওর রুমাল নাড়ল। কিন্তু লুসি মিনাকে লক্ষ্য করেছে বলে মনে হলো না। ও আসলে জানালায় হেলান দিয়ে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমাচ্ছিল। লুসির পাশে, একটা বড় পাখি দেখতে পেল মিনা। ও ঘরে ঢুকে দেখল লুসি শুয়ে পড়েছে খাটে, গলায় হাত। বিবর্ণ চেহারা।

জোনাথনের কাছ থেকে এখনও কোনো খোঁজখবর না পেয়ে নিদারুণ চিন্তায় পড়ে গেছে মিনা। এদিকে দিনদিন দুর্বল হয়ে পড়ছে লুসি। গোলাপরাঙা গাল কেমন ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। সারাক্ষণ ক্লান্তিতে ধুঁকতে থাকে। দম ফেলতেও কষ্ট হয়। আর ঘুমের মধ্যে হাঁটাহাঁটি তো আছেই। প্রায়ই জানালায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মিনা লক্ষ করেছে লুসির গলায় সেফটিপিনের খোঁচার দাগ দুটো মিলিয়ে যায় নি। বরং আরও প্রকট হচ্ছে আয়তনে।

ওদিকে ভুতুড়ে জাহাজের সেই পঞ্চাশটি মাটিভর্তি বাক্স লন্ডনে, কারফ্যাক্স এস্টেটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এস্টেটের প্রাচীন চ্যাপেলে, এর মালিকের নির্দেশমতো সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

কয়েকদিন পরে লুসির শরীর-স্বাস্থ্য আবার আগের ঔজ্জ্বল্য ফিরে পেল। সে মিনাকে নিয়ে গোরস্তানের প্রিয় জায়গাটিতে আবার যাতায়াত শুরু করে দিল। মিনা একদিন সে রাতের প্রসঙ্গ তুলল যে রাতে ঘুমের ঘোরে হাঁটতে হাঁটতে এখানে চলে এসেছিল লুসি।

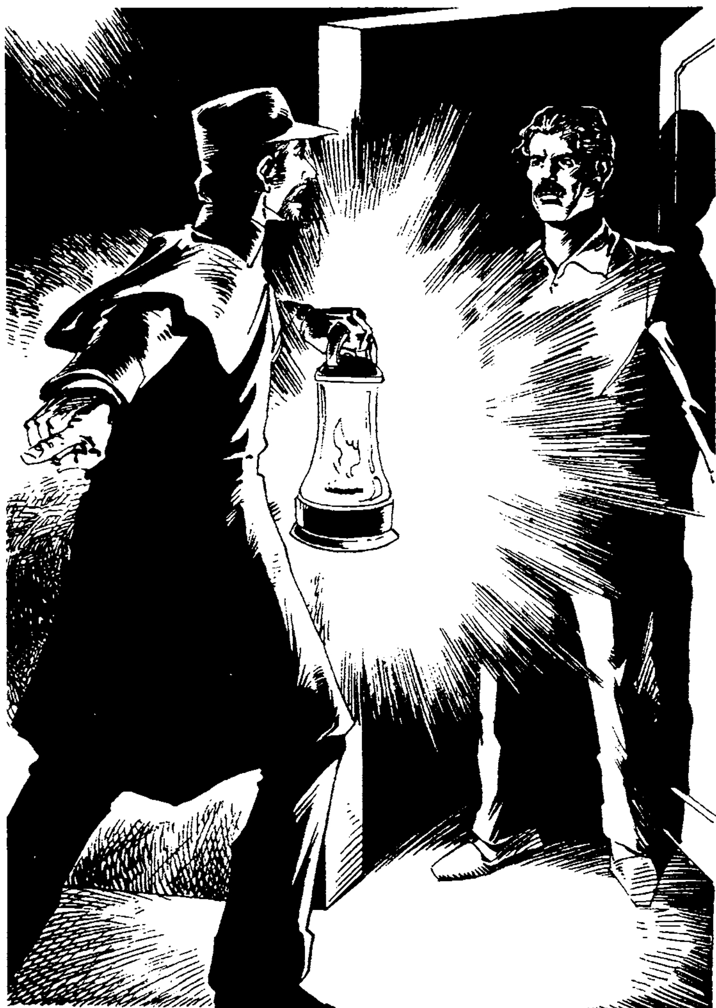
'ওই রাতের কোন কথা মনে পড়ে তোমার?' জিজ্ঞেস করল মিনা।

'অল্প অল্প মনে পড়ে। একটা কালো লোককে দেখেছি আমি, লাল টকটকে চোখ। কে যেন আমার কানে গুনগুন করে গাইছিল গান। মনে হচ্ছিল আমার আত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে বাতাসে ভেসে যাচ্ছে। তারপর মনে হলো ভূমিকম্প হচ্ছে। সারা শরীর কাঁপছিল আমার। তারপর জেগে উঠে দেখি তুমি আমাকে ধরে ঝাঁকাচ্ছ।'



মিনা সিদ্ধান্ত নিল ও ট্রানসিলভানিয়া যাবে

সে রাতের স্মৃতিচারণ করেও বিচলিত মনে হলো না লুসিকে। বান্ধবীর গালে আবার গোলাপের ছোপ ধরছে দেখে খুব খুশি মিনা। এই তো আবার আগের লুসিকে ফিরে পেয়েছে সে।



রেনফিল্ড পাগলাগারদ থেকে পালিয়েছে!

পরদিন মিনার জন্যে একটি সুখবর এলো। জোনাথনের খবর পেল ও। তবে সকল সংবাদ ভালো নয়। অসুস্থ হয়ে পড়েছে বেচারা। এজন্যই চিঠি লিখতে পারে নি। ট্রানসিলভানিয়ার এক হাসপাতাল থেকে একজন নার্স

লিখেছে :

'প্রিয় ম্যাডাম, মি. জোনাথন হারকারের শরীর খুব দুর্বল বলে তিনি নিজে চিঠি লিখতে পারেন নি। তবে তিনি দিনদিন সুস্থ হয়ে উঠছেন। ছয় সপ্তাহ ভয়ানক ব্রেইন ফিভার বা মস্তিষ্কের প্রদাহে ভুগেছেন তিনি। কোনো কারণে ভয়ানক শক পেয়েছেন ভদ্রলোক। তিনি শুধু নেকড়ে, বিষ আর ভূতপ্রেত নিয়ে কথা বলেন। এ সমস্যা কাটতে আরও অনেকদিন সময় লেগে যাবে। তবে উনি মানুষটা খুবই ভালো। আমরা তাঁর আচরণে অত্যন্ত মুগ্ধ। তাঁর আরোগ্য কামনা করে আমরা প্রতিদিন প্রার্থনা করি। ইতি: সিস্টার আগাথা।'

মিনা সিদ্ধান্ত নিল ও ট্রানসিলভানিয়া যাবে, সেবা করে সুস্থ করে তুলবে জোনাথনকে। তারপর ওকে নিয়ে বাড়ি ফিরবে। আর বিয়েটা করে ফেলবে এখুনি। দ্রুত যাত্রার পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতি নিয়ে ট্রানসিলভানিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল মিনা।

কাদামাটি ভর্তি বাক্সগুলো যখন কারফ্যাক্স এস্টেটে নিয়ে আসা হয়েছে, ওই সময় পাগলাগারদের সেওয়ার্ড তার রোগী রেনফিল্ডের মধ্যে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করল।

'লোকটা কোন কারণে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। সে কুকুরের মতো শুধু গন্ধ শুঁকে বেড়ায়,' নিজের ডাইরিতে লিখল ডাক্তার। 'ওকে খুব বিচলিত মনে হচ্ছিল। ও বারবার বলছিল, 'প্রভু এসে পড়েছেন।' সে মাকড়সা এবং মাছির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। তার এহেন পরিবর্তন দেখে আমি উদ্বেগ বোধ করছি। ওর ওপর আরও তীক্ষ্ণ নজর রাখা দরকার।'

সে রাতে, দুটোর দিকে, নৈশ প্রহরী ছুটতে ছুটতে এল ডা. সেওয়ার্ডের কাছে।

'রেনফিল্ড,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে, 'পাগলাগারদ থেকে পালিয়েছে!'

৭. রহস্যময় ব্যধি

পাহারাদারদের সতর্ক থাকতে বলে নিজেই রেনফিল্ডের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল ড. সেওয়ার্ড। ও ভয় পাচ্ছে ভেবে পাগল লোকটা পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে বাইরে চলে গেলে না জানি কী দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে বসে।

'ওই যে ও!' পাহারাদারদের উদ্দেশে চিৎকার করে উঠল ডাক্তার। রেনফিল্ডকে একঝলক দেখতে পেয়েছে সে। পাগলাগারদের উঁচু দেয়াল বেয়ে উঠছে উন্মাদটা। তারপর এক লাফে মাটিতে নেমেই ছুটল কারফ্যাক্স এস্টেট অভিমুখে।

ড. সেওয়ার্ড একটা মই এনে দেয়াল বাইল। দেখল রেনফিল্ড বাড়ির কিনারের দিকে যাচ্ছে, শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে। ওর পিছু নিল ডাক্তার। পাগলটা প্রাচীন চ্যাপেলের দরজার সামনে এসে হাজির হলো। বিড়বিড় করে আপন মনে কথা বলছে।

সাবধানে পা বাড়াল ডা. সেওয়ার্ড যাতে তার রোগী তাকে দেখে চমকে না যায়। রেনফিল্ডের কাছাকাছি এসেছে সে, শুনল উন্মাদ লোকটা বলছে, 'আমি আপনার আহ্বানে এখানে এসেছি, প্রভু। প্রভু, আমি আপনার ভৃত্য।'

এদিকে পাহারাদাররা এসে পড়েছে। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল রেনফিল্ডের ওপর। ছাড়া পাবার জন্যে বুনো জন্তুর মতো পাহারাদারদের সঙ্গে লড়াই করল সে। কিন্তু অতগুলো তাগড়া লোকের সঙ্গে একা পেরে উঠবে কী করে? ওরা রেনফিল্ডকে ঠেসে ধরে স্ট্রেট জ্যাকেট (উন্মাদরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে সেজন্যে লম্বা হাতাওয়ালা এক ধরনের জামা দিয়ে এদেরকে বেঁধে রাখা হয়) পরিয়ে দিল। পাহারাদাররা রেনফিল্ডকে নিয়ে এল পাগলাগারদে, দেয়াল এবং মেঝেতে প্যাড লাগানো একটি ঘরে

ঢোকাল। দেয়াল কিংবা মেঝেয় মাথা ঠুকে যাতে আত্মহত্যা করতে না পারে রেনফিল্ড; সেজন্যে গোটা ঘরে প্যাড লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেয়ালের সঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হলো তাকে। সে মেঝেয় বসে আপনমনে বিড়বিড় করতে লাগল, 'আমি ধৈর্যহারা হবো না, প্রভু।'

ডা. সেওয়ার্ড স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। যাক বাঁচা গেল। এমন ভয়ংকর একটা পাগলকে শেষতক পাকড়াও করা গেছে। না হলে কত লোকের যে মাথা ফাটাত রেনফিল্ড কে জানে?

মিনা ট্রানসিলভানিয়ায় চলেছে। প্রথমে জাহাজে, তারপর ট্রেনে চড়ে সে পৌঁছে গেল গন্তব্যে। জোনাথনকে দেখে তার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। বেচারা শুকিয়ে একদম কাঠ। বিবর্ণ চেহারা, ভীষণ দুর্বল শরীর। অনেক কিছুই সে মনে করতে পারছে না। মিনা বুঝতে পারছিল জোনাথনের জীবনে এমন কিছু ঘটেছে যার ফলে ভয়ানক মানসিক আঘাত পেয়ে তার এরকম দশা। নার্সরা মিনাকে বলেছে জোনাথন ভূত-প্রেত-দত্যি-দানোর কথা বলে। কিন্তু কেন বলে তারা জানে না।

'মিনা, প্রিয়তমা,' বলল জোনাথন। 'কী ঘটেছে মনে করার চেষ্টা করলে আমার মাথাটা কেমন চক্কর দিয়ে ওঠে। জানি না যা ঘটেছে তা সত্যি বাস্তব ছিল কি না, নাকি কেবলই উন্মাদের স্বপ্ন ছিল। আমাকে কথা দাও তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না। বিয়ে করবে আমাকে।'

'কথা দিচ্ছি, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না,' বলল মিনা। 'আর ধর্মযাজককে খবর দিয়েছি। উনি এলে আজই আমরা বিয়ে করব।'

জোনাথন এবং মিনা খুব দ্রুত তাদের বিয়েটা সেরে ফেলল। মিনা ইংল্যান্ডে, তার বান্ধবীকে চিঠি লিখল।

'সুপ্রিয় লুসি, আমি এখন মিসেস হারকার। আমি এখন খুব সুখী। জোনাথন তার জীবনে ঘটে যাওয়া ভয়ংকর অভিজ্ঞতাগুলো সম্পর্কে আমাকে এখনও কিছুই বলে নি। ও এখনও সুস্থিরভাবে কোন কিছু চিন্তা করতে পারে না, কেমন জট পাকিয়ে যায়। আজ কী বার কিংবা এটা কোন সাল, মনে থাকে না ওর। তবে আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠছে সে।



বিবর্ণ চেহারা, ভীষণ দুর্বল শরীর

জোনাথনকে বিয়ে করে আমি যেমন সুখী হয়েছি, আর্থারকে বিয়ে করেও তুমি নিশ্চয় তেমনই সুখী হবে। আজ আর নয়। তোমার প্রিয় বান্ধবী মিনা।'

লুসি মিনার খবর জেনে খুব খুশি হলো। ওর শরীর আগের চেয়ে ভালো। আজকাল ও আর রাতের বেলা ঘুমের ঘোরে হাঁটাহাঁটি করে না। আর্থার প্রায়ই ওকে দেখতে আসে। আর মাসখানেক পরেই ওদের বিয়ে।

কিন্তু লন্ডনে ফেরার পরে লুসি আবার দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগল। ওর এখন ঘুমোতে যেতেই ভয় লাগে যদি দুঃস্বপ্ন দেখতে হয়! আর সারাক্ষণ প্রচণ্ড ক্লান্তি ভর করে থাকে শরীরে। এক রাতে লুসির ঘুম ভেঙে গেল জানালায় খসখস শব্দে। জানালার কাচে ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ! লুসি দিনদিন ভয়ানক দুর্বল হয়ে যেতে লাগল। চেহারা রক্তশূন্য। শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হয় ওর। গলার সেই ক্ষত দুটো জ্বালা করে।

আর্থার তার বাগদত্তাকে দেখতে এসে রীতিমতো চমকে গেল। 'এ কী দশা হয়েছে তোমার!' আর্তনাদ করে উঠল সে। 'তোমার এক্ষুনি ডাক্তার দেখানো দরকার। আমি ডা. জন সেওয়ার্ডকে খবর পাঠাচ্ছি। ও কালকের মধ্যে এসে পড়বে।'

আর্থার লুসির বাড়ি থেকে সোজা নিজের বাসায় ফিরল। কারণ তার বাবাও খুব অসুস্থ। ডা. সেওয়ার্ড পরদিন এলো লুসিদের বাড়িতে। মেয়েটিকে পরীক্ষা করে দেখল সে। লুসির চেহারা একদম বদলে গেছে। ফ্যাকাসে মুখ। দেখে মনে হয় রক্তশূন্যতায় ভুগছে। লুসি জানাল ওর সবসময় দারুণ ক্লান্ত লাগে আর প্রতি রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে।

কিন্তু লুসির অসুস্থতার কোন কারণ খুঁজে পেল না ডা. সেওয়ার্ড। এ অসুস্থতা খুব রহস্যময় মনে হলো তার কাছে। লুসিকে ডাক্তার আর্থারের চেয়ে কোন অংশে কম ভালোবাসে না। লুসির জন্যে তার খুব চিন্তা হলো।

'আমি আমার প্রিয় শিক্ষক প্রফেসর ভ্যান হেলসিং-এর সঙ্গে যোগাযোগ করছি,' আর্থারকে চিঠিতে জানাল ডাক্তার। 'উনি হল্যান্ডে থাকেন। উনি এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। খুব দয়ালু এবং ভালো মানুষ। লুসির রহস্যময় রোগটি তিনি হয়তো বুঝতে পারবেন।'

পাগলাগারদে, রেনফিল্ডের রকমসকম তাজ্জব করে তুলল ডা. সেওয়ার্ডকে। মাঝে মাঝে রেনফিল্ড ভয়ানক হিংস্র হয়ে ওঠে, আবার



একী দশা হয়েছে তোমার

কখনও কখনও একদম চুপচাপ এবং শান্ত থাকে। দিনের বেলা তার উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়, রাতের বেলা ঠাণ্ডা।

রেনফিল্ডের গা থেকে স্ট্রেটজ্যাকেট খুলে নেওয়া হলো। কারণ তার পাগলামি আগের চেয়ে কমেছে। এ সুযোগে আবার পালাল সে। ডাক্তার জানত রেনফিল্ডকে কোথায় পাওয়া যাবে। কারফ্যাক্সের প্রাচীন চ্যাপেলে। পাহারাদাররা পাকড়াও করতে এলে তাদের সঙ্গে একচোট মারামারি হয়ে গেল রেনফিল্ডের। হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল সে। তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। দেখছে একটি কালো বাদুড় উড়ে যাচ্ছে।

'আমাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাবার দরকার নেই,' বলল রেনফিল্ড। 'আমি হেঁটেই যেতে পারব।'

পরদিন হাজির হলেন প্রফেসর ভ্যান হেলসিং। ডা. সেওয়ার্ডের সঙ্গে চললেন তার রোগিণীকে দেখতে। লুসিকে দেখে তিনি চমকে গেলেন। কেন এসেছেন তা অবশ্য ওকে জানালেন না। লুসির সঙ্গে সব বিষয় নিয়েই কথা বললেন শুধু ওর অসুস্থতা ছাড়া।

লুসিকে পরীক্ষা করার সময়ও তেমন কিছু বললেন না প্রফেসর। ডা. সেওয়ার্ড বুঝতে পারল প্রফেসর আসলে গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছেন তাই কথা বলতে চাইছেন না। ভ্যান হেলসিং শুধু বৈজ্ঞানিক কিংবা ডাক্তার নন, তিনি দর্শন নিয়েও পড়াশোনা করেছেন এবং অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে প্রচুর কাজ আছে তাঁর।

পরে প্রফেসর ডা. সেওয়ার্ডকে বললেন, 'আমি আমার জীবনে এমন অদ্ভুত ব্যাপার দেখি নি। লুসির শরীরে রক্ত নেই বললেই চলে। কিন্তু এত রক্ত হারাল কীভাবে সে? আশ্চর্য!'

কাজ ছিল বলে হল্যান্ডে ফিরে গেলেন ভ্যান হেলসিং, তবে কথা দিলেন কয়েকদিনের মধ্যেই আবার আসবেন। লুসির রোগের স্বরূপ নিয়ে কদিন পড়াশোনা করবেন।

'রোগীর ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখবে,' বললেন তিনি ডা. সেওয়ার্ডকে। 'ওর অবস্থার যদি অবনতি হয় সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবে।'

'ওর অবস্থা কি খুবই খারাপ?' জিজ্ঞেস করল ডাক্তার।

'খুবই খারাপ,' জবাব দিলেন প্রফেসর। 'এটা এখন জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন।'



জলদি কিছু করতে না পারলে তো মারা যাবে মেয়েটা

ওরা লুসির শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে যে কতটা উদ্বিগ্ন তা কিছুই বলল না লুসির মাকে। কারণ মেয়ের করুণ দশা জানলে আঘাতটা সামলাতে পারবেন না ভদ্রমহিলা। কী ঘটে দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা।

লুসির শারীরিক অবস্থার মোটেই পরিবর্তন হলো না। ভ্যান হেলসিং দেশ থেকে ফেরার পরে ডা. সেওয়ার্ড তাকে নিয়ে লুসির বাড়িতে গেল তাকে দেখতে। ওর চেহারা দেখে দুজনেই আঁতকে উঠল।

ভূতের মতো লাগছে লুসিকে। লালচে ক্ষত দুটো তার ঠোঁট এবং দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত পৌঁছেছে। কংকালসার চেহারা। চামড়া ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে হাড়। শ্বাস ফেলতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে লুসির। নিশ্চল শুয়ে আছে। কথা বলার শক্তিও নেই।

সর্বনাশ আঁতকে উঠলেন ভ্যান হেলসিং। 'জলদি কিছু করতে না পারলে তো রক্তশূন্যতায় মারা যাবে মেয়েটা।'

৮. বিপন্ন জীবন

'নষ্ট করার মতো সময় একদম নেই,' বললেন ভ্যান হেলসিং। 'এক্ষুনি রক্ত দিতে হবে। রক্ত কে দেবে তুমি নাকি আমি?'

'আমার বয়স কম, গায়ে জোরও বেশি, প্রফেসর,' বলল ড. সেওয়ার্ড। 'কাজেই আমারই রক্ত দেওয়া উচিত।'

'তাহলে তৈরি হয়ে নাও। আমি আমার ব্যাগটা নিয়ে আসি। ওতে আমার সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আছে।'

ওরা কাজ শুরু করতে যাচ্ছে, করাঘাত হলো দরজায়। আর্থার।

'আমি একরকম ছুটে এসেছি,' বলল সে। 'আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব বুঝতে পারছি না, প্রফেসর ভ্যান হেলসিং। আমার লুসি কেমন আছে?'

'তুমি ঠিক সময়েই এসে পড়েছ,' বললেন ভ্যান হেলসিং। 'ওর অবস্থা খারাপ। খুবই খারাপ। তবে ওকে তুমি সাহায্য করতে পারবে। ওর জীবন বাঁচাতে তোমার সাহায্যই বেশি প্রয়োজন।'

'আমাকে কী করতে হবে বলুন?' আকুল কণ্ঠে বলল আর্থার। 'ওর জন্যে আমি জীবনও দিতে পারি।'

'জীবন দিতে হবে না,' বললেন ভ্যান হেলসিং। 'লুসির অবস্থা ভয়ানক খারাপ। রক্তের দরকার ওর, নতুবা মারা যাবে মেয়েটা। ওর শরীরে রক্ত দিতে হবে। তোমার রক্ত দেবো ওকে।'

'আমি ওকে রক্ত দিতে এক পায়ে খাড়া,' বলল আর্থার।

'বেশ,' বললেন প্রফেসর। 'তবে জলদি করতে হবে। হাতে কিন্তু একদমই সময় নেই।'



এক্ষুনি রক্ত দিতে হবে

লুসি ঘুমায় নি তবে এতটাই দুর্বল যে কথা বলতে পারছে না। তবে ওর চোখ ভাষাহীন নয়। সে চোখে প্রেমিকের জন্যে ঝরে পড়ছে ভালোবাসা। আর্থারের শিরায় ঢোকানো একটি টিউব বা নল লুসির শিরাতে সংযুক্ত

করে দেওয়া হলো। রক্ত সঞ্চালন শুরু হতে অসুস্থ মেয়েটির চেহারায় ধীরে ধীরে উজ্জ্বল একটা ভাব ফুটে উঠতে লাগল। আর্থারের চেহারা ফ্যাকাসে হতে শুরু করেছে, ওদিকে লুসির মুখে ফিরে আসছে রং। তবে খুব একটা সুস্থ বোধ করল না সে। প্রচণ্ড দুর্বলতা মেয়েটাকে ভীষণভাবে অসুস্থ করে ফেলেছে।

রক্ত সঞ্চালন শেষ হলে ভ্যান হেলসিং আর্থারকে বললেন বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নিতে। 'বেশি বেশি ঘুমোবে, বেশি বেশি খাবে। তাহলেই দ্রুত ফিরে পাবে শক্তি। রক্ত সঞ্চালন সফল হয়েছে। তুমি ওকে মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরিয়ে এনেছ। ও সুস্থ হয়ে যখন জানবে তুমি ওর জীবন বাঁচিয়েছ, তোমার প্রতি ওর ভালোবাসা কয়েকগুণ বেড়ে যাবে।'

ডা. সেওয়ার্ড দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিল আর্থারকে। ফিরে এসে দেখল ভ্যান হেলসিং লুসির গলার দাগ দুটো পরীক্ষা করে দেখছেন।

'এ কিসের ঘা?' জিজ্ঞেস করলেন ভ্যান হেলসিং।

'দুটো ছোট গর্ত,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল ডা. সেওয়ার্ড।

'তবে এ ক্ষত দুটোর কারণ কোন রোগ নয়, যদিও এগুলো শুকোচ্ছে না। পুরোনো ঘা মনে হচ্ছে। হয়তো এ ক্ষত থেকেই ঝরছে রক্ত। কিন্তু অনবরত রক্ত ঝরলে তো লুসির বিছানার চাদর-বালিশ সব ভেসে যেত।'

'ব্যাপারটা আমার ভালো ঠেকছে না,' বললেন ভ্যান হেলসিং। 'আমি আবার হল্যান্ডে যাব কিছু বইপত্র নিয়ে আসতে। তুমি কিন্তু একদম লুসির কাছ ছাড়া হবে না। রাত জেগে ওকে পাহারা দেবে। খবরদার, ঘুমোনো চলবে না। লুসিকে এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করবে না।'

'কেন, খারাপ কিছু ঘটার আশঙ্কা করছেন?' প্রশ্ন করল ডা. সেওয়ার্ড।

'এখনই কিছু বলতে পারছি না। আমি যা বললাম সেভাবে কাজ কর— সারাক্ষণ ওর সঙ্গে থেকো। ওকে রেখে কোথাও গেলে ওর অবস্থা মারাত্মক খারাপ হতে পারে।'

ডা. সেওয়ার্ড সারা রাত লুসির ঘরে বসে রইল। দুচোখের পাতা এক



লুসিকে এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করবে না

করল না। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পরে লুসিকে আগের চেয়ে একটু সুস্থ লাগল। ডাক্তার লুসির মাকে বলল সে আজ রাতটাও তার মেয়েকে পাহারা দেবে। দরকার নেই, মানা করলেন তিনি।

'ওর অবস্থার তো অনেক উন্নতি হয়েছে, ডাক্তার,' বললেন মিসেস ওয়েস্টেনরা। 'তা ছাড়া সারারাত না ঘুমিয়ে তুমিও বেজায় ক্লান্ত।'

'প্রফেসর ভ্যান হেলসিং-এর নির্দেশ অমান্য করা ঠিক হবে না।' বলল ডা. সেওয়ার্ড। 'উনি ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনার মেয়েকে একা রেখে যাওয়া উচিত হবে না।'

সে রাতে অসুস্থতার কারণে খুব ক্লান্তিবোধ করছিল লুসি। তবে ও যে চোখ বুজতে ভয় পাচ্ছে তা ডা. সেওয়ার্ড ঠিকই বুঝতে পারল।

'তোমার ঘুম আসছে না?' জিজ্ঞেস করল ডাক্তার।

'দুঃস্বপ্ন দেখার ভয়ে ঘুমোতে পারছি না।'

'আমি তোমার পাশে সারারাত আছি,' বলল সেওয়ার্ড। 'তুমি দুঃস্বপ্ন দেখছ মনে হলেই সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে ঘুম থেকে তুলে দেব। তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও।'

লুসি ডাক্তারের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করল। সে এরপর ঘুমিয়ে পড়ল এবং সারারাত শান্তিতে ঘুমাল। পরদিন ওকে বেশ সজীব লাগল।

দিনের বেলা ডা. সেওয়ার্ডকে পাগলাগারদে যেতে হয়। ডিউটি করতে। দিনের শেষে কুকুরের মতো ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে।

'আমার জন্যে সারাক্ষণ বসে থাকতে হবে না,' বলল লুসি। 'আমি এখন ভালোই আছি। তুমি পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো। কোন কিছুর দরকার হলে আমি ডাকব তোমাকে। তখন চলে এস।'

লুসির জেদের কাছে হার মানল ডা. সেওয়ার্ড। সে পাশের ঘরের সোফায় গিয়ে হাত-পা টানটান করে শুয়ে পড়ল। ক্লান্ত শরীরে দ্রুত নেমে এলো ঘুম। পরদিন সকালে প্রফেসর ভ্যান হেলসিং ফিরলেন হল্যান্ড থেকে। তিনি ঘুম থেকে জাগালেন ডা. সেওয়ার্ডকে। 'তোমার রোগী কেমন আছে?'

'ভালো,' জবাব দিল ডাক্তার। 'ওর শরীরের দিন দিন উন্নতি হচ্ছে।'

'চলো তো, একবার দেখে আসি।'



ক্লান্ত শরীরে দ্রুত নেমে এলো ঘুম

লুসির ঘরে ঢুকেই কালো হয়ে গেল প্রফেসরের মুখ। 'ওহ্, মাই গড!' হায় হায় করে উঠলেন তিনি।

লুসি শুয়ে আছে বিছানায়, শ্বাস নিচ্ছে না বললেই চলে, মুখটা মরা

মানুষের মতো সাদা। আগের চেয়ে অনেক বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছে। চোয়াল ঢুকে গেছে ভেতরে, উল্টে আছে ঠোঁট, দেখা যাচ্ছে মাড়িসহ দাঁত।

'আমাদের সব পরিশ্রম বৃথা গেল!' বললেন প্রফেসর। 'জলদি! ওর শরীরে আবার রক্ত দিতে হবে।'

এবারে তিনি ডা. সেওয়ার্ডের শরীর থেকে রক্ত নিলেন। লুসিকে রক্ত দিতে পেরে মনে মনে খুশিই হলো সেওয়ার্ড। সে-ও লুসিকে খুব ভালোবাসে। তবে রক্ত দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ল সে, ঝিমঝিম করছে মাথা।

'কিন্তু প্রফেসর, ও এত রক্ত হারাল কী করে? শরীরে রক্তক্ষরণের তো কোন চিহ্ন নেই। শুধু গলায় দুটো পিন ফোটার দাগ ছাড়া।'

লুসির যখন জ্ঞান ফিরল, তখনও সে যথেষ্ট দুর্বল। ভ্যান হেলসিং ডা. সেওয়ার্ডকে বললেন আজ রাতটা তিনি লুসির সঙ্গে থাকবেন।

'ও এরকম অসুস্থ হয়ে পড়ছে কেন?' প্রশ্ন করল সেওয়ার্ড। 'এরকম ঘটনা আমার জীবনে এই প্রথম।'

'সে ব্যাখ্যা তোমাকে আমি পরে দেবো', জবাব দিলেন প্রফেসর।

সে রাতে প্রফেসর ভ্যান হেলসিং লুসির শিয়রের পাশে জেগে থেকে ওকে সারারাত পাহারা দিলেন। লুসির মুখ খানা তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরখ করলেন। পরদিন কতকগুলো সাদা ফুল নিয়ে ঢুকলেন লুসির ঘরে।

'মাই ডিয়ার, এগুলো তোমার জন্য,' বললেন ভ্যান হেলসিং।

'ধন্যবাদ, প্রফেসর,' বলল লুসি। 'কিন্তু এসবের আবার কী দরকার ছিল?'

'এগুলো কোন উপহার নয়,' বললেন প্রফেসর।

'ফুলগুলোর গন্ধ শোঁকো।'

গন্ধ শুঁকল লুসি। হেসে উঠল। 'এ তো রসুন। রসুন দিয়ে কী হবে? আপনি কি আমার সঙ্গে মজা করছেন?'

শক্ত হলো ভ্যান হেলসিংয়ের চোয়াল, কুঁচকে গেল ভুরু, দৃষ্টিতে ফুটল



রসুনের মালা ওকে শান্তিতে ঘুমাতে দিল

রাগ। 'আমি মজা করি না। এ ফুলগুলো আনার পেছনে নিশ্চয় কারণ আছে। তোমাকে যা যা করতে বলব, করবে। আমার হুকুম অমান্য করা চলবে না।'

প্রফেসরের ক্রুদ্ধ কণ্ঠ চমকে দিল লুসিকে। বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে বুঝতে পেরে প্রফেসর সামলে নিলেন নিজেকে। লুসিকে নরম গলায় বোঝালেন রসুনগুলো আনা হয়েছে ওর ভালোর জন্যই। এগুলো আসলে এক ধরনের ওষুধ।

তারপর তিনি ঘরের সবজায়গায় বিছিয়ে দিতে লাগলেন রসুন। শক্ত করে জানালা বন্ধ করে ফাঁক-ফোঁকরে রসুন গুঁজে দিলেন। রসুনের মালা ঝুলিয়ে রাখলেন দরজার ওপরে এবং ফায়ার প্লেসের দুই পাশে। রসুনের একটা মালা তিনি লুসির গলায় পরিয়ে দিলেন।

'প্রফেসর,' বলল ডা. সেওয়ার্ড। 'আপনি তন্ত্রমন্ত্র দিয়ে ভূত তাড়াচ্ছেন নাকি?'

'হতে পারে সেরকম কিছু একটা,' জবাব দিলেন ভ্যান হেলসিং। লুসির দিকে ফিরে বললেন, 'গলার রসুনের মালা কোনভাবেই খুলবে না। আজ রাতে ঘরের কোন জানালা খোলা যাবে না। মনে থাকবে?'

'জ্বি,' বলল লুসি। 'মনে থাকবে। আপনাদের দুজনকেই অনেক ধন্যবাদ।'

চলে যাওয়ার সময় প্রফেসর ডা. সেওয়ার্ডকে বললেন, 'আজ রাতটা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারব। আজ রাতে লুসির কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

ঘুমিয়ে পড়ল লুসি। রসুনের মালা ওকে শান্তিতে ঘুমাতে দিল। ওই রাতে আর দুঃস্বপ্ন দেখল না লুসি।

পরদিন বেশ সকাল সকাল ডা. সেওয়ার্ডকে নিয়ে লুসির বাড়িতে চলে এলেন প্রফেসর ভ্যান হেলসিং। লুসির মা ইতিমধ্যে উঠে পড়েছেন ঘুম থেকে। অবশ্য তিনি ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেগে যান।

'লুসি আজ ভালোই আছে,' বললেন তিনি। 'এখনও ঘুমোচ্ছে। আমি এক পলক দেখে এসেছি ওকে। তবে ওকে আর জাগাই নি। যতক্ষণ ইচ্ছা ঘুমোক। আপনাদের জন্যই মেয়েটা আমার শান্তিতে একটু ঘুমোতে পারছে। আপনাদেরকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেবো!'



লুসির নিশ্চিন্তে নিদ্রার পেছনে আমারও কিছু সামান্য ভূমিকা আছে

'ধন্যবাদ দিতে হবে না,' দুহাতের তালু ঘষতে ঘষতে বললেন প্রফেসর। ডা. সেওয়ার্ডের দিকে তাকালেন। 'আমার সাবধানতায় কাজ হয়েছে। এবারে হয়তো লুসির অসুস্থতার কারণটা জানা যাবে।'

'তবে লুসির নিশ্চিন্তে নিদ্রার পেছনে আমারও কিন্তু সামান্য ভূমিকা আছে,' বললেন লুসির মা।

'কী রকম?' জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর।

'গতরাতে লুসির জন্যে খুব চিন্তা হচ্ছিল আমার। তাই ওর ঘরে যাই উঁকি মেরে দেখে আসতে কী করছে আমার মেয়ে। দেখি গভীর নিদ্রায় মগ্ন লুসি। আমি ঘরে ঢুকেছি, অথচ টেরও পায় নি। তবে ঘরটায় কেমন একটা গুমোট গন্ধ। লক্ষ্য করলাম সারাঘরে রসুন ছড়ানো। এমনকি ওর গলাতেও ঝুলছে রসুনের মালা। লুসির শরীর এমনিতেই দুর্বল, এর মধ্যে রসুনের ঝাঁঝালো গন্ধে নিঃশ্বাস নিতে ওর নিশ্চয় খুব কষ্ট হচ্ছে ভেবে আমি ওর গলা থেকে রসুনের মালা খুলে নিই এবং তাজা বাতাসের জন্যে খুলে দিই জানালা। কী, কাজটা ঠিক করি নি? তাজা বাতাসে মেয়েটা আমার আরও ভালো ঘুম হয়েছে।'

বৃদ্ধা গেলেন নাশতা বানাতে। ডা. সেওয়ার্ড তাকাল প্রফেসর ভ্যান হেলসিংয়ের দিকে। প্রফেসরের মুখখানা সাদা ছাই।

'সেরেছে!' গুঙিয়ে উঠলেন তিনি।

৯. নেকড়ের ডাক

'আমরা মেয়েটার জন্যে কত কষ্ট করলাম,' আফসোসের সুরে চেঁচিয়ে উঠলেন ভ্যান হেলসিং। 'আর আমাদের সব পরিশ্রম ব্যর্থ করে দিলেন লুসির মা। তাঁকে বলতেও পারব না যে তিনি মেয়ের কী সর্বনাশ করেছেন।'

'সর্বনাশ মানে?' প্রশ্ন করল ডা. সেওয়ার্ড। 'কিসের সর্বনাশ?'

'এত কিছু ব্যাখ্যা করার সময় নেই,' বললেন ভ্যান হেলসিং। 'আমার সঙ্গে এসো। শয়তান তাড়াতে হবে।'

মেডিকেল ব্যাগ নিয়ে তিনি ছুটলেন। ডা. সেওয়ার্ডকে নিয়ে চলে এলেন দোতলায়। এখানে লুসির শোবার ঘর। ঘরে ঢুকে যে দৃশ্য দেখলেন প্রফেসর, তাতে মোটেই অবাক হলেন না। লুসির চেহারা শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে, মোমের মতো চকচক করছে চামড়া। এতটা অসুস্থ আগে কখনও লাগে নি লুসিকে।

'হাতে সময় খুব কম,' বললেন ভ্যান হেলসিং। 'আবার রক্ত দিতে হবে। তোমার শরীর দুর্বল। এবারে আমিই রক্ত দেবো।'

ডা. সেওয়ার্ড রক্ত সঞ্চালনের কাজটি করল। ভ্যান হেলসিংয়ের রক্ত লুসির শিরায় ঢুকল। মেয়েটার চেহারায় আবার ফিরে এল ঔজ্জ্বল্যতা। নিশ্বাস-প্রশ্বাস হয়ে উঠল স্বাভাবিক।

ভ্যান হেলসিং লুসির মাকে বললেন তাঁর অনুমতি ছাড়া মিসেস ওয়েস্টনরা যেন লুসির ঘর থেকে কোন কিছু না সরান।

'ওর ঘরে রসুন বিছানো হয়েছে ওর চিকিৎসার জন্যে,' ব্যাখ্যা দিলেন প্রফেসর। 'এতে মেয়েটা সুস্থ হয়ে উঠবে।'

পরবর্তী কয়েকটি রাত ভ্যান হেলসিং লুসিকে পাহারা দিয়ে রাখলেন।

লুসি এ কটি রাত শান্তিতে ঘুমোল। তার মনে হচ্ছিল দীর্ঘ দুঃস্বপ্ন দেখার পরে ওর যেন ঘুম ভেঙেছে। যে প্রচণ্ড ভীতি ওকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল সেকথা লুসির এখন প্রায় মনেই নেই। মনে হচ্ছে ওগুলো দূর অতীতের কথা। রসুনের গন্ধ আগে সহ্য করতে না পারলেও এখন এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে লুসি।

এক রাতে ঘুম ভেঙে গেল লুসির। দেখল প্রফেসর ভ্যান হেলসিং নাক ডেকে ঘুমোচ্ছেন। ওর জানালার কাছে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে কিছু একটা ডানা ঝাপটাচ্ছিল। কিন্তু এবারে আর ভয় পেল না লুসি। ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

ওই একই সময় শহরে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। লন্ডন চিড়িয়াখানার তত্ত্বাবধায়ক এক রাতে হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল নেকড়ের খাঁচা থেকে ভেসে আসা তীব্র এক হুংকারে। কী হয়েছে দেখতে ছুটে গেল সে। দেখল খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তালগাছের মতো লম্বা, রোগা-পাতলা এক লোক। জানোয়ারটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। লোকটার চেহারা দেখলেই বোঝা যায় এ ভালো মানুষ নয়, শীতল একটা ভাব ফুটে আছে মুখে, চোখ জোড়া অঙ্গারের মতো জ্বলছে।

'নেকড়েগুলো দেখছি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছে,' মন্তব্য করল লোকটা।

'হয়তো আপনাকে দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে,' বলল তত্ত্বাবধায়ক। লোকটাকে প্রথম দর্শনেই অপছন্দ হয়েছে তার।

'আরে না, আমি কেন ওদেরকে উত্তেজিত করতে যাব,' বলে হাসল লোকটা। তার মুখভর্তি সাদা, ধারালো দাঁত।

কথা বলতে বলতে নেকড়ের খাঁচার কাছে এগিয়ে গেল সে, হাত ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। নেকড়েটা সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ল মেঝেতে। লোকটা বাড়ানো হাত দিয়ে চুলকে দিল জানোয়ারটার কান। 'নেকড়েরা আমাকে পছন্দ করে,' বলল সে।

'আপনি কি চিড়িয়াখানায় কাজটাজ করেন নাকি?' জিজ্ঞেস করল তত্ত্বাবধায়ক।



নেকড়েগুলো খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছে

'না,' জবাব দিল লোকটা। 'তবে আমার অনেক পোষা নেকড়ে আছে।' বলে মাথার হ্যাট টেনেটুনে ঠিক করে চলে গেল সে।

সে রাতে চিড়িয়াখানার সবচেয়ে বড় নেকড়েটি পালিয়ে গেল!

তত্ত্বাবধায়ক দেখল খাঁচার গরাদ বাঁকানো এবং নেকড়ে অদৃশ্য। ওই রাতে চিড়িয়াখানায় অচেনা কোন মানুষকে কেউ ঢুকতে দেখে নি। তবে একজন পাহারাদার জানাল সে ধূসর রঙের প্রকাণ্ড একটা জানোয়ার দেখেছে। বোধহয় কুকুর।

সারা লন্ডন শহরে খবর ছড়িয়ে পড়ল চিড়িয়াখানা থেকে একটি নেকড়ে পালিয়ে গেছে। শহরের বাচ্চারা খুব ভয় পেয়ে গেল। তারা আর ঘর থেকে বেরোবার সাহস পেল না। তবে পরদিন নেকড়েটি আবার ফিরে এলো চিড়িয়াখানায়। কেউ জানে না সে কোথায় গিয়েছিল। তত্ত্বাবধায়ক লক্ষ্য করল নেকড়েটার গা কাচের আঘাতে কেটে গেছে।

যে রাতে নেকড়েটি চিড়িয়াখানা থেকে পালিয়েছিল, সে রাতে লুসি যথারীতি গলায় রসুনের মালা জড়িয়ে নিয়ে ঘুমাতে গেল। মাঝরাতে জানালায় থাবা আঁচড়ানোর পরিচিত খসখস শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। হুইটবিতে রাতের বেলা ঘুমের ঘোরে হাঁটার সময় থেকে এ শব্দ শুনে আসছে সে।

আবার চোখ বুজতে ভয় লাগল লুসির। যদি দুঃস্বপ্ন দেখে! জেগে থাকার চেষ্টা করল ও, কিন্তু প্রচণ্ড ঘুমে বুজে আসছে চোখ। একা একা খুব ভয় লাগছে ওর। ও দোরগোড়ায় গিয়ে হাঁক ছাড়ল। 'কেউ আছ?' কেউ সাড়া দিল না।

বাইরে, ঝোপের আড়াল থেকে ভেসে এলো একটা চিৎকার। মনে হচ্ছে কুকুর ডাকছে তবে ডাকটা অনেক বেশি গভীর এবং ভয়ংকর। জানালার সামনে গেল লুসি। তাকাল। কিছুই দেখতে পেল না। শুধু জানালার কাচে এসে ডানা ঝাপটাচ্ছে প্রকাণ্ড একটা বাদুড়।

বিছানায় ফিরে এলো লুসি। এক মিনিট পরে খুলে গেল ওর ঘরের দরজা। ওর মা।

'তোকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, মা,' বললেন মিসেস ওয়েস্টেনরা। 'দেখতে এলাম তুই ঠিক আছিস কি না।'



তত্ত্বাবধায়ক দেখল খাঁচার গরাদ বাঁকানো

মা-র আবার ঠাণ্ডা লেগে না যায় ভেবে উৎকণ্ঠা বোধ করল লুসি। মাকে বলল বিছানায় এসে ওর সঙ্গে শুতে। দুজনে একসঙ্গে শুলে আর শীত করবে না।

জানালায় আবার সেই খড়মড় আওয়াজ হলো। লুসির মা আঁতকে উঠলেন। 'কী ওটা?'

দুজনেই এবার ঝোপ থেকে ভেসে আসা নিচু গলার ভয়ংকর ডাকটা শুনতে পেল।

হঠাৎ জানালার কাচ ভেঙে চুরচুর হয়ে গেল! বাতাসে পতপত করে উড়তে লাগল পর্দা, বিদ্যুৎগতিতে ঘরে ঢুকে পড়ল ধূসর রঙের প্রকাণ্ড একটা নেকড়ে।

ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন লুসির মা। আত্মরক্ষার জন্যে বাড়িয়ে দিলেন হাত, কোন অস্ত্র-টস্ত্র পাওয়া যায় কি না। তাঁর হাত বাড়ি খেল লুসির গলায় ঝুলতে থাকা রসুনের মালায়। প্রফেসর ভ্যান হেলসিং লুসিকে বারবার সাবধান করে দিয়েছিলেন। এ মালা যেন সে ভুলেও গলা থেকে না খোলে। লুসির মা-র হাতের খোঁচায় রসুনের মালাটা ছিঁড়ে গেল।

তিনি চট করে উঠে বসলেন বিছানায়, হাত তুললেন ভয়ংকর জানোয়ারটার দিকে। একটা অদ্ভুত, ঘরঘরে আওয়াজ বেরিয়ে এলো তাঁর গলা থেকে। তারপরই বিছানায় এলিয়ে পড়লেন, যেন বজ্রপাত হয়েছে মাথায়।

লুসির মাথার সঙ্গে বাড়ি খেল ওর মা-র মাথা। কয়েক মুহূর্তের জন্যে চোখে সর্ষেফুল দেখল লুসি। ঘরটা যেন বোঁবোঁ করে ঘুরছে চারপাশে। জানালা দিয়ে অসংখ্য আলোকবিন্দু ঢুকে পড়ল ঘরে। লুসি নড়াচড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ওর মা ঢলে পড়ে আছেন ওর গায়ের ওপর। মারা গেছেন বৃদ্ধা। কিছুক্ষণের জন্যে সবকিছু বিস্মৃত হলো লুসি। হারিয়ে ফেলল জ্ঞান।

জ্ঞান ফিরে পাবার পরে লুসি শুনতে পেল চারদিকে ডাকছে নেকড়ের দল। একটা ঘণ্টা বাজছে। বাইরে থেকে ভেসে এলো পাখির মিষ্টি গান। লুসির মনে হলো ওটা পাখি নয়, তার মৃত মা ওকে মধুর স্বরে ডাকছেন।

লুসিদের দুই ভৃত্য ছুটে এলো। লুসির মা-র লাশটাকে লুসির গায়ের ওপর



দুজনেই মদ খেয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে

থেকে সরিয়ে নিয়ে একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিল। তারপর গায়ের ওপর রাখল রসুন ফুল। ভ্যান হেলসিং কী বলেছিলেন মনে পড়ল লুসির। তবে সে মা-র শরীর থেকে রসুন সরাল না।

ভৃত্য দুটো লুসির মা-র লাশ চাদর দিয়ে ঢেকে রেখে সেই যে গেছে আর আসার নাম নেই। লুসি ওদের খোঁজে চলল। দেখল দুজনেই মদ খেয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে।

লুসি এখন তার মৃত মাকে নিয়ে একা। জানালা বন্ধ করার উপায় নেই। কারণ ভেঙে গেছে কাচ। বাইরে নেকড়েরা নিচু গলায় গজরাচ্ছে। ভীষণ ভয় পেল লুসি। এখন সে কী করবে? যা-ই ঘটুক না কেন, ওর বসে বসে দেখা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

১০. মৃত্যুর কবলে

পরদিন সকালে ডা. সেওয়ার্ড দ্রুত লুসিদের বাড়ি এলো। দরজায় কড়া নাড়ল। কিন্তু সাড়া পেল না কারও। খারাপ কিছু ঘটে নি তো? ভয় পেয়ে গেল ডাক্তার। বাড়ির চারপাশটা একবার চক্কর দিল কোথাও থেকে ভেতরে ঢোকা যায় কি না দেখতে।

একটু পরেই হাজির হলেন ভ্যান হেলসিং। তাঁকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল ডা. সেওয়ার্ড।

'আমরা বোধহয় দেরি করে ফেলেছি,' বললেন প্রফেসর। 'জলদি! ভেতরে ঢোকার রাস্তা না পেলে দরজা ভেঙে ঢুকতে হবে।'

বাড়ির পেছন দিকে, রান্নাঘরের একটা জানালা খুলে ওরা ভেতরে ঢুকলেন। সেই ভৃত্য দুটোকে দেখতে পেলেন। মদের নেশায় এখনও ঘুমোচ্ছে। ওঁরা এক ছুটে উঠে এলেন দোতলায়, লুসির ঘরে।

দৃশ্যটা দেখে আঁতকে উঠলেন দুজনেই! লুসি আর তার মা পড়ে আছে বিছানায়। লুসির মা-র চেহারায় প্রচণ্ড ভয় পাবার অভিব্যক্তি ফুটে আছে।

আর লুসির মুখখানা ভূতের মতো সাদা। গলার ক্ষত দুটো আবার দগদগে ঘায়ের মতো দেখাচ্ছে। প্রফেসর ছুটে গেলেন লুসির কাছে। ওর বুকে মাথা রেখে শুনলেন হৃদস্পন্দন।

'এখনও সময় আছে!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'ও বেঁচে আছে।'

'আবার রক্ত দিতে হবে ওকে,' বলল ডা. সেওয়ার্ড।

'আগে ওর শরীরে উষ্ণতা ফিরিয়ে আনা দরকার।' বললেন ভ্যান হেলসিং। 'ওর গা মরা মানুষের মতো ঠাণ্ডা। জলদি পানি গরম কর। লুসিকে গরম পানিতে গোসল করাব।'

ডা. সেওয়ার্ড ভৃত্যদের ঘুম ভাঙিয়ে পানি গরম করতে বলল। তারপর লুসিকে নিয়ে গেল বাথরুমে। গরম পানিতে ওকে গোসল করাল।



ভেতরে ঢোকার রাস্তা না পেলে দরজা ভেঙে ঢুকতে হবে

'আমরা মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই করছি,' বলল ডা. সেওয়ার্ড।

'ব্যাপারটা যদি তেমন কিছু হতো, আমি আর ওকে বাঁচানোর চেষ্টা করতাম না, মরতে দিতাম শান্তিতে,' বললেন ভ্যান হেলসিং। 'ওর আসলে জীবন বলে কিছু নেই। খুব ভয়ানক কিছু-একটা ঘটে গেছে ওর জীবনে।'

গোসল শেষে লুসির শরীর গরম কাপড় দিয়ে মুছে দিলেন ওরা। লুসির হৃদস্পন্দনের মাত্রা আগের চেয়ে সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

এমন সময় দরজায় কেউ নক করল। কুইন্সি মরিস এসেছে। আর্থারের আমেরিকান বন্ধু। আর্থার ওকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে। তার বাবার মর মর দশা। তাই আর্থার বাবার কাছে গেছে।

'তুমি ঠিক সময়েই এসেছ,' বলল ডা. সেওয়ার্ড। 'ওকে রক্ত দিতে হবে।'

লুসিকে রক্ত দিতে রাজি হয়ে গেল মরিস।

'আমি ওকে সাহায্য করার জন্যে একপায়ে খাড়া,' বলল সে। 'জানোই তো আমিও লুসির প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম।'

দুই ডাক্তার রক্ত সঞ্চালনের জন্যে প্রস্তুত হলো। রক্ত দেওয়ার পরে লুসির অবস্থার উন্নতি হলো সামান্যই।

'এটা কী করে সম্ভব?' রক্ত দেওয়ার পরে জিজ্ঞেস করল কুইন্সি। 'চার চারজন তাগড়া পুরুষ ওকে রক্ত দিল। অথচ তারপরও লুসির গায়ে রক্ত নেই। গেল কোথায় এত রক্ত?'

'জানি না,' জবাব দিল ডা. সেওয়ার্ড। 'এমন রহস্যময় ঘটনা জীবনে এই প্রথম দেখছি।'

সেদিন বিকেলে জ্ঞান ফিরে পেল লুসি। ওর শরীর আগের চেয়ে সামান্য ভালো ঠেকছে। তাকাল ঘরের চারপাশে। হঠাৎ একটা চিৎকার দিয়ে হাউমাউ কান্না জুড়ে দিল লুসি। ওর মনে পড়ে গেছে যে মারা গেছেন মা।

সারাটা বিকেল মনমরা হয়ে রইল লুসি, মাঝে মাঝে কেঁদে উঠল হু হু করে। সূর্যাস্তের পরে ও ঘুমিয়ে পড়ল। দুই ডাক্তার পালাক্রমে পাহারা দিল লুসিকে। মেয়েটা শান্তিতে ঘুমোল। কুইন্সি মরিস বাড়ির বাইরে পাহারা দিল নেকড়েটা যদি আবার ফিরে আসে সে আশংকায়।

ভোরবেলায় লুসির খুব দুর্বল লাগল। মাথাও নাড়াতে পারছে না, প্রায় কিছুই মুখে দিল না। এই ঘুম, এই জাগরণের মাঝে কেটে গেল

সারাদিন। ডা. সেওয়ার্ড লক্ষ্য করেছে খুবই বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে লুসিকে। ওর দাঁতগুলো দিন দিন স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি লম্বা এবং সুচাঁলো হয়ে উঠেছে।

আর্থারের কাছে ওরা একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিল। টেলিগ্রাম পেয়ে সে সঙ্গে সঙ্গে লন্ডনে চলে এলো। লুসির চেহারা দেখে দারুণ চমকে গেল আর্থার। বলল লুসিকে ছেড়ে সে কোথাও যাবে না, সারাক্ষণ ওর কাছেই বসে থাকবে। কিন্তু প্রফেসর ভ্যান হেলসিং ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিশ্রাম করতে পাঠালেন।

ওরা আরেকটি ঘরে নিয়ে এসেছে লুসিকে। দরজা-জানালা সব বন্ধ করে রেখেছে। প্রফেসর আবার সব জায়গায় রসুনের কোয়া গুঁজে দিলেন।

ডা. সেওয়ার্ড লুসির শিয়রে বসে আছে, লক্ষ্য করল মেয়েটার দুঠোঁটের কোনা দিয়ে লম্বা দুটো দাঁত বেরিয়ে রয়েছে। কুকুর বা নেকড়ের শ্বদন্তের মতো। ধারালো এবং সুচালো। অন্য দাঁতগুলোর চেয়ে লম্বা।

আরে, জানালায় ডানা ঝাপটানোর শব্দ হচ্ছে না? আপনমনে বিড়বিড় করল ডা. সেওয়ার্ড। ঘটনা কী দেখতে গেল সে। বিরাট একটা বাদুড় নখ দিয়ে জানালার কাচে আঁচড় কাটছে। ডা. সেওয়ার্ড ফিরে এলো লুসির কাছে। লুসি ঘুমের মধ্যে টান মেরে ছুটিয়ে ফেলেছে গলার রসুনের মালা। যেন রসুনের গন্ধ আর সহ্য হচ্ছে না। সেওয়ার্ড মালাটা ঠিকঠাক করে আবার পরিয়ে দিল লুসির গলায়।

ভোরবেলায় ভ্যান হেলসিং এলেন ডা. সেওয়ার্ডকে ছুটি দিতে। লুসির দিকে তাকালেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দম যেন বন্ধ হয়ে এলো।

'জানালার পর্দা তুলে দাও,' ব্যস্ত সুরে বললেন তিনি। 'আমার আলো দরকার।'

ডা. সেওয়ার্ড জানালার পর্দা তুলে দিল। তারপর চলে এলো বিছানার পাশে। প্রফেসর লুসির গলার ক্ষত পরীক্ষা করে দেখছেন। 'দেখো!' বললেন তিনি। 'গলার ক্ষত দুটো নেই। একদম মিলিয়ে গেছে।'

'এর মানে কী, প্রফেসর?' জিজ্ঞেস করল ডা. সেওয়ার্ড।



কুইন্সি মরিস বাড়ির বাইরে পাহারা দিল

'ও মারা যাচ্ছে! কিন্তু ওর মৃত্যুটা কি ঘটবে জাগ্রত অবস্থায়? নাকি ঘুমন্ত অবস্থায়? আর্থারকে এক্ষুনি একবার আসতে বলো।'

ডা. সেওয়ার্ড আর্থারের কাছে গেল। তাকে ঘুম থেকে জাগাল। প্রফেসর লুসি সম্পর্কে যে কথাগুলো বলেছেন তা ওকে জানাল। দুজনে মিলে দ্রুত

পা বাড়াল লুসির ঘরে। ভ্যান হেলসিং লুসির চুল আঁচড়ে দিয়েছেন যাতে ওর চেহারাটা খুব বেশি বদখত না দেখায়।

'আর্থার প্রিয়তম,' ফিসফিস করে ডাকল লুসি, 'কাছে এসো।'

চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াচ্ছে, আর্থার লুসির বিছানায় গিয়ে বসল। ওর হাত ধরে রাখল। ঘুমিয়ে পড়ল লুসি। ঘনঘন ওঠানামা করছে বুক। ডা. সেওয়ার্ডের চোখ আবার চলে গেল লুসির লম্বা, সুচালো শ্বদন্তের দিকে।

ঘুম থেকে জেগে উঠে লুসি বলল, 'আমাকে চুমু খাও, আর্থার। প্লিজ, আমাকে চুম্বন কর।'

'না!' চেঁচিয়ে উঠলেন ভ্যান হেলসিং। আর্থারের ঘাড় ধরে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন দূরে। 'ওকে চুমু খেয়ো না!'

আর্থার তো অবাক। মানে কী এর?

'ধন্যবাদ,' প্রফেসরকে ফিসফিসিয়ে বলল লুসি। 'আপনি প্রকৃত বন্ধুর মতো কাজ করেছেন। আর্থারকে আমার কাছে ঘেঁষতে না দিয়ে খুব ভালো করেছেন। এখন আমি মরেও শান্তি পাব।'

মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর ভ্যান হেলসিং। আর্থারকে বললেন, 'তুমি ওকে চুমু খেতে পার, তবে ঠোঁটে নয়, কপালে।'

তাই করল আর্থার। লুসির আবার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেল। হঠাৎ থেমে গেল বুকের ওঠা-নামা।

'ও মারা গেছে,' বললেন ভ্যান হেলসিং।

ডা. সেওয়ার্ড আর্থারকে আরেকটি ঘরে নিয়ে গেল। ফিরে এসে দেখে ভ্যান হেলসিং অপলক দৃষ্টিতে লুসির মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। মৃত্যু লুসির হারানো সৌন্দর্য অনেকটাই ফিরিয়ে দিয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে, অসুস্থতার সময়টাতে ওকে যতটা বিবর্ণ এবং ম্লান দেখাচ্ছিল এখন আর তেমনটা দেখাচ্ছে না।



বিরাট একটা বাদুড় নখ দিয়ে জানালার কাচে আঁচড় কাটছে

'বেচারা,' বলল ডা. সেওয়ার্ড, 'অবশেষে শান্তি পেল।'

ভ্যান হেলসিং ওর দিকে ফিরলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, 'না, ও শান্তি পায় নি। বরং অশান্তির পালা শুরু হলো মাত্র।'



ভয়ংকর ঘটনাগুলো ঘটার কারণ জানার চেষ্টা করছেন তাঁরা

১১. লন্ডনে ড্রাকুলা

ওরা পরের দিনটি ধার্য করলেন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যে। লুসি এবং তার মাকে পাশাপাশি কবর দেওয়া হবে।

ডা. সেওয়ার্ড এবং প্রফেসর ভ্যান হেলসিং লুসির লেখা ডায়েরি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লেন। ওর জীবনের ভয়ংকর ঘটনাগুলো ঘটার কারণ জানার চেষ্টা করছেন তাঁরা।

'এখন একটু বিশ্রাম না নিলেই নয়,' সন্ধ্যা ঘনাবার পরে বললেন ভ্যান হেলসিং। 'সামনে আরও অনেক কাজ পড়ে আছে।'

ঘুমোতে যাবার আগে মৃত মেয়েটিকে আরেকবার দেখতে গেলেন তাঁরা। লুসির মুখ ঢাকা একটি কাপড়ে। কাপড়টা তুলতেই ভ্যান হেলসিং এবং ডা. সেওয়ার্ড দারুণ চমকে গিয়ে এক কদম পিছিয়ে এলেন। অসুস্থ হবার আগে লুসি যেমন সুন্দরী ছিল, ঠিক সেরকম সুন্দর লাগছে এখন ওকে। মৃত্যু ওর সৌন্দর্য বিন্দুমাত্র ম্লান করতে তো পারেই নি বরং আরও উদ্ভাসিত করে তুলেছে রূপ। অসুস্থতার কোন চিহ্নই নেই চেহারায়।

'আমার চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না,' বলল ডা. সেওয়ার্ড।

প্রফেসরের মুখে আঁধার ঘনাল। চিন্তিত চেহারা।

'আমি আসছি এখুনি। তুমি থাকো,' বলে চলে গেলেন তিনি।

কিছুক্ষণ পরে কতকগুলো রসুন-ফুল নিয়ে এলেন তিনি। ফুলগুলো লাশের পাশে অন্যান্য ফুলের সঙ্গে রেখে দিলেন। সোনার ছোট একটি ক্রুশ রাখলেন লুসির মুখের ওপর। তারপর চাদর টেনে ঢেকে দিলেন মুখ।

'প্রফেসর,' বলল ডা. সেওয়ার্ড, 'আমি জানি আপনি সুস্থ মস্তিষ্কের সচেতন একজন মানুষ। কিন্তু আপনার কাণ্ডকারখানা বড্ড রহস্যময় লাগছে। এর কোন মাথামুণ্ডু খুঁজে পাচ্ছি না আমি।'

'অকারণে কোনদিন কোন কাজ আমাকে করতে দেখেছ?' জিজ্ঞেস করলেন ভ্যান হেলসিং। 'আর্থারকে তার প্রিয়তমার ঠোঁটে চুমু খেতে দিই নি বলে তুমি অবাক হয়েছ। কিন্তু লুসির চোখে এজন্যে আমি ফুটে উঠতে দেখেছি কৃতজ্ঞতা। আমার ওপর আস্থা রাখো, জন। আমাদের সামনে অদ্ভুত এবং ভয়ংকর দিন অপেক্ষা করছে। আমাদেরকে একত্রে কাজ করতে হবে।'



ভ্যান হেলসিং এবং ডা. সেওয়ার্ড দারুণ চমকে গিয়ে এক কদম পিছিয়ে এলেন

ডা. সেওয়ার্ড ভ্যান হেলসিং-এর হাত মুঠোয় চেপে ধরে প্রতিশ্রুতি দিল সে প্রফেসরকে যতটা পারে সাহায্য করবে।

পরদিন, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আগে, আর্থার এলো তার ভালোবাসার

মানুষটিকে আরেকবার দেখতে।

'কী যে সুন্দর লাগছে ওকে!' ডা. সেওয়ার্ডকে বলল সে। 'আমার দেখে অবাক লাগছে। দেখে মনেই হয় না যে ও মারা গেছে।'

ডা. সেওয়ার্ডও লুসির মৃত্যু-পরবর্তী চেহারা দেখে কম তাজ্জব নয়। প্রতি ঘণ্টায় যেন লুসির রূপ ফেটে পড়ছে।

আর্থার লুসির হাতে এবং কপালে চুমু খেল। তারপর কফিনের ডালা নামিয়ে দিয়ে পেরেক মেরে দিল।

লন্ডন থেকে পশ্চিমে, বহুদূরে, এক্সিটার নামের একটি জায়গায় মিনা এবং জোনাথন হারকারও একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এসেছে। জোনাথন যে আইনজীবীর সঙ্গে কাজ করত, মি. হকিন্স, তিনি মারা গেছেন। এখন ফার্মের মালিক জোনাথন। সারাদিন ফার্ম নিয়ে ব্যস্ততায় কাটে তার সময়।

আইনি কিছু জটিলতার সমাধানে লন্ডন গিয়েছিল জোনাথন। সঙ্গে মিনা। এক সন্ধ্যায় ওরা রাস্তায় হেঁটে বেড়াচ্ছে। দোকানপাট দেখছে, এমন সময় জোনাথন এত জোরে মিনার হাত খামচে ধরল যে রীতিমতো ব্যথা পেল মেয়েটা।

'কী ব্যাপার?' প্রশ্ন করল মিনা।

'মাই গড!' জোরে শ্বাস টানল জোনাথন।

জোনাথনের চোখ যেন কোটর ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে।

সে লম্বা, রোগা-পাতলা একটা লোকের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'ও কে জানো?' ফিসফিস করল জোনাথন।

'না গো। ওকে আমি চিনি না,' বলল মিনা। 'কে ও?'

'সেই লোকটা! কাউন্ট! কিন্তু লোকটার বয়স হঠাৎ এত কমে গেল কী করে? এটা কী করে সম্ভব?'



দুহাতে মুখ ঢেকে বাঁধভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়ল মিনা

চলে গেল লম্বা লোকটা। জোনাথন ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়েছে। মিনা ভয় পেল আবার না সে মস্তিষ্কের প্রদাহে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তবে পরদিন সকালে পুরো ব্যাপারটা ভুলে গেল জোনাথন।

মিনা অস্বস্তিতে ভুগছে। সে তার স্বামীর ডায়েরি পড়েছে। ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না জোনাথন ট্রানসিলভানিয়ার কাউন্ট ড্রাকুলার দুর্গ-প্রাসাদ নিয়ে যা লিখেছে তা সত্য নাকি মিথ্যা। হয়তো পুরোটা জোনাথনের কল্পনাও হতে পারে। জোনাথন ট্রানসিলভানিয়ায় গিয়েছিল কাউন্টকে লন্ডনে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু ও যা বলেছে সব যদি সত্যি হয়? ড্রাকুলা কি সত্যি এখন লন্ডনে? তাহলে তো শতশত মানুষের জীবন বিপন্ন। কাউন্ট এদেরকে ধরে ধরে তার শিকার বানাবে।

এক্সিটারে, নিজেদের বাড়ি ফিরে এসে মিনা দেখল তার নামে টেলিগ্রাম এসেছে। টেলিগ্রাম পড়েই দুহাতে মুখ ঢেকে বাঁধভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

'কী হয়েছে, ডার্লিং?' জিজ্ঞেস করল জোনাথন।

'লুসি,' কাঁদতে কাঁদতে বলল মিনা। 'ও মারা গেছে। ওর মা-ও আর বেঁচে নেই। আজ ওদের দুজনকে কবর দেওয়া হবে।'

'আহারে!' আফসোস করল জোনাথন। 'বেচারা লুসি! কিন্তু টেলিগ্রামটা পাঠাল কে?'

'ভ্যান হেলসিং নামে এক ভদ্রলোক,' বলল মিনা। 'উনি এখানে আসবেন বলেছেন। আমার সঙ্গে লুসির ব্যাপারে কথা বলবেন। লিখেছেন ব্যাপারটা নাকি খুব জরুরি।'

পরদিনই এক্সিটারে হাজির হয়ে গেলেন ভ্যান হেলসিং। মিনা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে ছিল। শিক্ষিত, পণ্ডিত মানুষটি নিশ্চয় জোনাথনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার একটি ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

'চিন্তা কোরো না,' মিনাকে আশ্বস্ত করলেন প্রফেসর। 'তোমার বান্ধবী লুসিকে নিয়ে যেসব অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, তোমার স্বামীও যদি সেরকম একই পথের যাত্রী হয়ে থাকে, নিশ্চিন্তে সব কথা বলতে পার আমাকে। আমি আগ্রহ নিয়েই শুনব।'

জোনাথনের ক্যাসল ড্রাকুলা বিষয়ক সফরের কথা প্রফেসরকে বলল মিনা। অবাক চোখে পুরো গল্পটা শুনলেন বৃদ্ধ, গল্প শোনার ফাঁকে ফাঁকে



জোনাথন ট্রানসিলভানিয়ায় গিয়েছিল

অসংখ্য প্রশ্ন করলেন তিনি মিনাকে।

'একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত,' মিনার গল্প বলা শেষ হলে মন্তব্য করলেন ভ্যান হেলসিং, 'তোমার স্বামীর জীবনে যা ঘটেছে তার মধ্যে কোন

অতিরঞ্জন নেই, সবই সত্য। এ নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আমি যত দ্রুত সম্ভব তোমার স্বামীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই।'

'ও কাজে খুব ব্যস্ত,' বলল মিনা। 'তবে আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারলে ও খুশিই হবে। একটা কথা, প্রফেসর।'

'কী?'

'জোনাথন ডায়েরিতে যা লিখেছে, ওর জীবনে যা ঘটেছে, তা যদি সত্যি হয়, তাহলে একটা ব্যাপার নিশ্চিত যে ড্রাকুলা এখন লন্ডনে। দানবটা হয়তো নিরীহ মানুষদের তার শিকারে পরিণত করার মতলব করছে।'

'ঠিকই বলেছ তুমি,' সায় দিলেন ভ্যান হেলসিং। 'শিগগিরই একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে এজন্যে তোমাদের দুজনের সাহায্য দরকার আমার।'

'আপনাকে যতদূর সম্ভব আমরা সাহায্য করব,' প্রতিশ্রুতি দিল মিনা।

লন্ডনে ফিরে ডা. সেওয়ার্ডের সঙ্গে দেখা করলেন ভ্যান হেলসিং।

'কাগজে একটা খবর পড়লাম,' বললেন তিনি। 'পড়ার পর থেকে খচখচ করছে মন।' তিনি কাগজটা দিলেন ডাক্তারকে পড়তে।

কাগজে লিখেছে, সম্প্রতি লন্ডনে অনেকগুলো বাচ্চা ছেলেমেয়ে হারিয়ে গেছে। এদের কারও কারও খোঁজ পাওয়া গেছে। তারা সবাই সাদা পোশাকপরা এক সুন্দরী মহিলার কথা বলেছে। বাচ্চাদেরকে বাইরে থেকে দেখলে সুস্থ মনে হলেও আসলে তারা খুবই দুর্বল। তাদের সবার মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে। যেন রক্তশূন্যতায় ভুগছে।

'বাচ্চাগুলোকে একবার দেখে আসি চলো,' বললেন ভ্যান হেলসিং। ডা. সেওয়ার্ডকে নিয়ে চলে এলেন একটি হাসপাতালে এখানে বাচ্চাগুলোর চিকিৎসা চলছে। হাসপাতালের লোকেরা ডাক্তারকে চেনে। তারা সেওয়ার্ডকে একটি বাচ্চাকে পরীক্ষা করে দেখার অনুমতি দিল।



বাচ্চাদের গলার ওই ক্ষতের জন্যে দায়ী মিস লুসি নিজেই

সেওয়ার্ড বাচ্চাটাকে পরীক্ষা করে দেখে আসার পরে প্রফেসর জিজ্ঞেস করলেন, 'কী দেখলে?'

'গলায় ক্ষত,' জবাব দিল সেওয়ার্ড। 'লুসির গলার মতো ক্ষত। ছোট ছোট। ক্ষতগুলো সৃষ্টি হবার পেছনে কি একই কারণ দায়ী?'

'না,' জবাব দিলেন ভ্যান হেলসিং। 'একটা কথা জিজ্ঞেস করি, জন, তোমার কি মনে হয় না এমন কিছু ঘটতে পারে যার ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দিতে অক্ষম?'

'আমি বিজ্ঞানের ছাত্র,' জবাব দিল সেওয়ার্ড। 'আমি মনে করি সবকিছুরই ব্যাখ্যা আছে।'

'কিন্তু সম্মোহন?' বললেন প্রফেসর। 'এ বিষয়টিকে কি অদ্ভুত মনে হয় না? তারপর ধরো, দক্ষিণ আমেরিকার রক্তপায়ী বাদুড়গুলোর কথা। ওরা ঘোড়ার শরীরের রক্ত চুষে খায়। এটাও কি অদ্ভুত ব্যাপার নয়?'

'আপনার কি ধারণা লুসি এবং বাচ্চাগুলোকে বাদুড়ে কামড়েছে?' প্রশ্ন করল ডাক্তার।

'না,' জবাব দিলেন ভ্যান হেলসিং, 'অবিশ্বাস্য কিছু ঘটনা সামনে ঘটতে চলেছে। তুমি মানসিকভাবে প্রস্তুত থেকো। এমন কিছু ঘটনা হয়তো তুমি প্রত্যক্ষ করবে যা বিশ্বাসই হতে চাইবে না। তুমি জানতে চেয়েছ বাচ্চাদের গলার দাগ আর মিস লুসির গলার ক্ষতের সৃষ্টি একইভাবে হয়েছে কি-না। না, ঘটনা সেভাবে ঘটে নি। বরং আরও খারাপ একটা ব্যাপার ঘটেছে। অনেক অনেক খারাপ।'

'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না, প্রফেসর।'

'বাচ্চাদের গলার ওই ক্ষতের জন্যে দায়ী মিস লুসি নিজেই।'

১২. জিন্দালাশ

'ড. ভ্যান হেলসিং, এসব বলছেন কী আপনি?' চেঁচিয়ে উঠল ডা. সেওয়ার্ড। 'পাগল হয়ে গেছেন?'

'পাগল হতে পারলেই বরং ভালো হতো,' বললেন ভ্যান হেলসিং। 'আমি মিস লুসিকে অবমাননা করে কিছু বলি নি। আজ রাতে আমার সঙ্গে গোরস্তানে চলো। আমি যা বলেছি তা যে মিথ্যা নয়, হাতে-নাতে প্রমাণ করে দেবো।'

লুসির ভয়ংকর কোন দিক উন্মোচিত হোক তা চায় না সেওয়ার্ড। কারণ লুসিকে সে ভালোবাসত, এখনও বাসে। তবু প্রফেসরের সঙ্গে যেতে রাজি হলো ডাক্তার। দুজনে রাতে একসঙ্গে সেরে নিল নৈশ ভোজ, তারপর চলল গোরস্তানে, যেখানে কবর দেওয়া হয়েছে লুসিকে।

'আর্থার আমাকে একটা চাবি দিয়েছে,' বললেন ভ্যান হেলসিং। সমাধির দরজা খুললেন তিনি, ডা. সেওয়ার্ডকে আগে ভেতরে যেতে দিলেন।

কবরের ওপরে রাখা তাজা ফুলগুলো এখন শুকিয়ে, নিস্তেজ পড়ে আছে। মাকড়সা আর গুবরে পোকার দল বাসা বেঁধেছে ওখানে। ভ্যান হেলসিং ব্যাগ খুলে একটি স্ক্রু ড্রাইভার বের করলেন।

'কী করছেন?' জিজ্ঞেস করল সেওয়ার্ড।

'ওর কফিন খুলব। আমার অনুমান যে মিথ্যা নয় প্রমাণ হয়ে যাবে।'

তিনি কফিনের ডালার পেরেকগুলো খুলে নিয়ে ওটা মেলে ধরলেন। ভেতরে সিসার একটি বাক্স। ভ্যান হেলসিং বাক্স ফুটো করতে লাগলেন। ডা. সেওয়ার্ড পচা লাশের গন্ধের ভয়ে কয়েক কদম পিছিয়ে গেল।

ভ্যান হেলসিং বাক্সের খোলা মুখে মোমবাতি ধরলেন। ভেতরে উঁকি দিল ডা. সেওয়ার্ড। কফিন খালি!



দুজনে একসঙ্গে চলল গোরস্থানে

মুখ হাঁ হয়ে গেল সেওয়ার্ডের, তবে প্রফেসর মোটেই অবাক হন নি।

'লাশটা কোথায় গায়েব হয়েছে বলে তোমার ধারণা?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ভ্যান হেলসিং।

'নির্ঘাত কবর চোরদের কাজ,' বলল ডা. সেওয়ার্ড। 'ওরাই গায়েব করেছে লাশ।'

ভ্যান হেলসিং আবার কফিনের ডালা লাগিয়ে দিলেন।

'অপেক্ষা কর নিজেই দেখতে পাবে,' বললেন তিনি। 'তুমি কবরের ওই দিকটাতে গিয়ে আড়াল নাও। আমি এদিকটাতে লুকোচ্ছি। চোখ-কান খোলা রেখো।'

দূরের ঘড়ি গম্ভীর স্বরে জানান দিল রাত বারোটা বাজে। ওরা দুজন অপেক্ষা করতে লাগল। ঘড়িতে একটা বাজল, তারপর দুটো। শীতে জমে যাবার দশা ডা. সেওয়ার্ডের।

হঠাৎ সে দেখতে পেল সাদামতো কী যেন একটা ছুটে আসছে কবরের দিকে। গাছপালার ছায়ার ভেতর থেকে আসছে। জিনিসটা কী দেখতে ডা. সেওয়ার্ড দ্রুত সামনে এগোতে গিয়ে একটা পাথরখণ্ডে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আবার সাদা শরীরটা দেখতে পেল ও। লুসির কবরের দিকে একটা ঝিলিক মেরে চলে গেল। তারপর আর তাকে দেখা গেল না।

সেওয়ার্ড ভ্যান হেলসিং-এর কাছে গিয়ে দেখে তিনি ঘুমন্ত একটি বাচ্চাকে বুকে চেপে ধরে আছেন।

'কী, এখন বিশ্বাস হলো তো?' জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর।

'না,' বলল ডা. সেওয়ার্ড। 'আমি এক ঝলক কী দেখেছি কিছুই ঠাহর করতে পারি নি।'

'বাচ্চাটার দিকে তাকাও,' বললেন ভ্যান হেলসিং। একটি দেশলাই কাঠি জ্বালালেন।

ডা. সেওয়ার্ড ছোট ছেলেটার গলা পরীক্ষা করল। গলায় দাগটাগ বা কোন ক্ষতচিহ্ন নেই।

'আমরা সময়মতো এসে পড়েছিলাম বলে বাচ্চাটা বেঁচে গেল।' বললেন প্রফেসর। ওরা বাচ্চাটাকে নিয়ে চলল। এমন কোথাও রেখে আসবে যাতে পুলিশের চোখে পড়ে বাচ্চাটা। পুলিশের এক লোককে আসতে দেখে ওরা বাচ্চাটাকে রাস্তায় রেখে দিয়ে হাঁটতে লাগল বাড়ির উদ্দেশে।



সমাধির দরজা খুললেন প্রফেসর

'কাল,' ভ্যান হেলসিং বললেন ডা. সেওয়ার্ডকে, 'সত্যিকারের প্রমাণ তোমাকে দেখাব।'

পরদিন বিকেলে ওরা আবার গোরস্তানে গেল। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যাবতীয় কাজ শেষ। ওরা এখন একা। লুসির কবরের সামনে এসে দাঁড়ালেন প্রফেসর।

'কফিন খুলে লাভ কী?' বলল ডা. সেওয়ার্ড। 'ওটা তো খালি।'

'দেখা যাক খালি নাকি ভেতরে কেউ আছে,' বললেন ভ্যান হেলসিং। কফিনের ডালা খুলে ফেললেন তিনি।

কফিনের ভেতরে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল ডা. সেওয়ার্ড। ওখানে শুয়ে আছে লুসি, অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা দারুণ সজীব। ঠোঁট লাল, গালে গোলাপি ছোপ।

'ওর দাঁত দেখো,' বললেন ভ্যান হেলসিং। লুসির ঠোঁট ফাঁক করে দেখালেন। 'ওর দাঁত আগের চেয়ে লম্বা এবং ধারালো হয়ে গেছে। এই সুচালো শ্বদন্ত দিয়েই সে ছোট ছোট বাচ্চাদের ওপর হামলা চালাচ্ছে।'

'আমি এ ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না,' বলল ডা. সেওয়ার্ড। 'এর মানেটা কী?'

'মানে হলো লুসি এখন জিন্দালাশে পরিণত হয়েছে,' জবাব দিলেন ভ্যান হেলসিং।

'এক ভ্যাম্পায়ারের কামড় খেয়েছে ও। নিজেও এখন ভ্যাম্পায়ার হয়ে গেছে। ওকে ঘুমের মধ্যে হত্যা করতে হবে। আর্থার এবং কুইন্সির সাহায্য দরকার। কাজটা কঠিন। তবু করতেই হবে।'

ওরা গোরস্তান থেকে চলে এলো বাড়িতে।

পরদিন ডা. সেওয়ার্ড এবং ভ্যান হেলসিং সাক্ষাৎ করল আর্থার এবং কুইন্সির সঙ্গে।

'আমাদের সাহায্য দরকার,' আর্থারকে বললেন প্রফেসর।

'তোমরা লুসিকে ভালোবাসতে তাই তোমাদেরকে আসতে বলেছি। তবে আগেই বলে রাখছি কাজটা কিন্তু কঠিন হবে।'

'আপনি কী বলছেন কিছু বুঝতে পারছি না,' বলল আর্থার।

'আমরা জানি লুসি মারা গেছে। কিন্তু যদি সে সত্যি মারা না গিয়ে থাকে?'

'মানে?' চেঁচিয়ে উঠল আর্থার। 'ওকে কি আমরা জ্যান্ত কবর দিয়েছি?'



লুসি এখন জিন্দালাশে পরিণত হয়েছে

'না, ও জিন্দালাশে পরিণত হয়েছে,' বললেন ভ্যান হেলসিং। 'এখন একটা কাজ করতে হবে আমাদের। ওর আত্মাকে মুক্তি দিতে হবে।'

'কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব?'

'আমি বলে দেবো। আগে প্রমাণ দেখ। ডা. সেওয়ার্ড প্রমাণ পেয়ে বিশ্বাস করেছে আমি মিথ্যা কথা বলি নি। তোমরা নিজেদের চোখেই দেখতে পাবে।'

সে রাতে গোরস্তানে মিলিত হলো চার জন। কালোমেঘে ঢাকা চাঁদ, তবে মাঝে মাঝে মেঘ সরে গেলে ফিক করে হেসে উঠছে জোছনা। ওরা লুসির কবরের সামনে এসে দাঁড়াল।

'গতকাল আমরা লুসিকে তার কফিনে দেখে গেছি,' বললেন ভ্যান হেলসিং। 'তাই না, ডা. সেওয়ার্ড?'

'জ্বি।'

ভ্যান হেলসিং লুসির কফিন খুললেন।

'কী দেখছ তোমরা?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

কফিন খালি!

'ও গেল কোথায়?' গর্জন ছাড়ল আর্থার। 'ওর লাশের আপনারা কী করেছেন?'

'কিছু করি নি,' বললেন ভ্যান হেলসিং। 'লুসি কোথায় গেছে নিজেরাই দেখতে পাবে।'

ওরা কবর ছেড়ে উঠে পড়ল। রাতের তাজা বাতাসে শ্বাস নিল বুক ভরে। কবরের গুমোট, দুর্গন্ধযুক্ত হাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল সবার। ভ্যান হেলসিং সমাধির দরজা বন্ধ করে দিলেন। চারপাশে বিছিয়ে দিলেন কতগুলো রসুন।

'এখন আমরা অপেক্ষা করব,' বললেন তিনি।

ওরা গোরস্তানে লুকিয়ে থাকল। অপেক্ষা করছে। ভয়ে বুক ঢিবঢিব করছে সবার। না জানি কী ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে হয়। তারপর, আঁধার ফুঁড়ে বেরোল ওটা। সাদা রঙের একটা কাঠামো, এক মহিলা। হাতে ঘুমন্ত একটি বাচ্চা। আর্থার ছুটে যেতে চাইছিল, ওকে টেনে ধরে রাখলেন ভ্যান হেলসিং।

নারীমূর্তি কাছে এগিয়ে আসছে। মেঘের আড়াল ভেঙে উঁকি দিল চাঁদ। আলোয় মহিলার মুখখানা দেখা গেল পরিষ্কার। লুসি!

ওরা চারজন সমাধির দরজায় পা বাড়াল। ভ্যান হেলসিং হাতের লণ্ঠনটি উঁচিয়ে ধরলেন নারীমূর্তির দিকে। সে এদিকেই আসছে। মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে সবার হৃদস্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে এলো।

ওটা লুসিই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ কোন লুসি? তার চেহারা থেকে সমস্ত কমনীয়তা উধাও, সেখানে ফুটে আছে নির্মমতা। আলো দেখে পিছিয়ে গেল লুসি, ওদেরকে লক্ষ্য করে দাঁতমুখ খিঁচল। লুসির ঠোঁট রক্তে মাখামাখি। তাজা রক্ত রঞ্জিত করে তুলেছে পরনের সাদা গাউন। ওর চোখজোড়া লাল টকটকে, রাগে জ্বলছে।

বাচ্চাটাকে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিল লুসি। কুকুরের মতো গর্জে উঠল। মাটিতে পড়ে ব্যথা পেয়েছে বাচ্চাটা। কাঁদছে।

লুসির ঠোঁট বেঁকে গেল ভয়ংকর এক হাসির ভঙ্গিতে। 'আমার কাছে এসো, আর্থার,' বলল ও। 'এসো, একসঙ্গে কফিনে ঘুমোব। চলে এসো, আমার স্বামী, এসো।'

ভারি মিষ্টি গলায় ডাকছে লুসি। ওর কণ্ঠ শুনে যেন পাগল হয়ে গেল আর্থার। দুবাহু বাড়িয়ে ওর দিকে এগোল। সঙ্গে সঙ্গে ভ্যান হেলসিং লাফ মেরে আর্থারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ওর পথ আটকে দিয়ে। সোনার একটি ক্রুশ বাগিয়ে ধরলেন লুসির দিকে।

বিদুৎস্পৃষ্টের মতো পিছিয়ে গেল লুসি। ঝড়ের গতিতে প্রফেসরকে পাশ কাটাল সে, ছুটল নিজের কবরে। কিন্তু রসুন দেখে আর কফিনে ঢুকতে পারল না। ঘুরল লুসি। ওদের দিকে তাকাল। তীব্র ঘৃণায় জ্বলছে চোখ। ঝকঝক করছে। বেঁকে গেছে ভুরু। রক্তাক্ত মুখখানা হাঁ হয়ে গেল। খুনের নেশা চাউনিতে।

'এখন আমার কথা বিশ্বাস হলো তো?' আর্থার এবং কুইন্সিকে জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর। 'দেখলে তো ও কিসে পরিণত হয়েছে?'


বাচ্চাটাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল লুসি

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল দুজনে। 'এখন আমাদেরকে কী করতে হবে বলুন।'

লুসির কবরের চারপাশ থেকে রসুনের কোয়াগুলো তুলে নিলেন ভ্যান

হেলসিং। লুসি কফিনের দরজা না খুলেই একটা ফাটল দিয়ে সাঁৎ করে ঢুকে গেল ভেতরে।

'কাল বিকেলে আমরা আবার এখানে আসব।' বললেন ভ্যান হেলসিং। 'ওকে শান্তির রাজ্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করব।'

তিন তরুণ আর্থার, কুইন্সি এবং ডা. সেওয়ার্ড পরদিন বিকেলে সাক্ষাৎ করল প্রফেসর ভ্যান হেলসিংয়ের সঙ্গে। লক্ষ্য করল প্রফেসরের হাতে সকল সময়ের সঙ্গী ডাক্তারি ব্যাগটি নেই, বদলে তিনি চামড়ার লম্বা বস্তা নিয়ে এসেছেন।

সমাধিস্থলে গেল ওরা। প্রবেশ করল ভেতরে। ভ্যান হেলসিং লুসির কফিনের ডালা খুললেন। কফিনে শুয়ে আছে লুসি।

'ওকে এখন আগের মতোই সুন্দর লাগছে,' মন্তব্য করল আর্থার।

'প্রফেসর, এটা কি সত্যি লুসি নাকি ওর ছদ্মবেশে কোন পিশাচ?'

'এটা ওর শরীর বটে তবে এটা আসল লুসি নয়,' জবাব দিলেন ভ্যান হেলসিং। ঠোঁটের কিনার ঘেঁষে বেরিয়ে আসা ধারালো দুটো দাঁত আর রক্তের দাগে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'এখুনি কাজে নামতে হবে, বন্ধুগণ।'

ব্যাগ খুলে অপারেশন করার কতকগুলো ছুরি বের করলেন প্রফেসর। আরেকটি কফিনের ওপর ওগুলো রাখলেন। তারপর তিন ফুট লম্বা, তিন ইঞ্চি মোটা, কাঠের একটি গোঁজ বের করলেন। গোঁজের মুখটা সুচালো। একটি ভারী হাতুড়িও নিলেন।

'জিন্দালাশদের মৃত্যু নেই,' বললেন প্রফেসর। 'ওরা যাদের শিকার করে বা রক্ত খায়, তারাও পরে পরিণত হয় জিন্দালাশে। লুসি যদি তোমাকে চুমু খাওয়ার সুযোগ পেত, আর্থার, তুমিও জিন্দালাশ হয়ে যেতে। যেসব বাচ্চার রক্ত খেয়েছে লুসি, তারাও একসময় ভ্যাম্পায়ারে পরিণত হবে। জিন্দালাশের অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি পেতে হলে লুসিকে আবার মরতে হবে। তাহলেই ওর আত্মা মুক্তি পাবে।'

'কী করতে হবে আমাকে বলুন,' বলল আর্থার। 'আমি ভয় পাব না।'



এটা কি সত্যি লুসি নাকি ওর ছদ্মবেশে কোন পিশাচ

'কাজটা কঠিন,' বললেন ভ্যান হেলসিং। 'এই গোঁজটা সরাসরি ওর বুকে ঢুকিয়ে দিতে হবে। তারপর আমরা ওর মাথা কেটে ফেলব।'

মোটা গোঁজটা নেওয়ার সময় হাত কাঁপল আর্থারের। সে গোঁজের সুচালো

মুখটা লুসির ঠিক কলজে বরাবর বসাল। ভ্যান হেলসিং মৃত লুসির জন্যে প্রার্থনা শুরু করলেন। আর্থার হাতুড়ি উঁচিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে বাড়ি মারল গোঁজে।

কফিনে শোয়া জিনিসটার শরীর মোচড় খেল। লাল ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এলো কান ফাটানো, বিকট চিৎকার। প্রবল ঝাঁকি খেল শরীর। ধারালো দাঁতগুলো একটা আরেকটার সঙ্গে আটকে গেল খটাশ করে।

আর্থার আর দ্বিধা করল না। গোঁজটাকে বাড়ি মেরে মেরে লুসির বুকে ঢুকিয়ে কলজেটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এলো রক্ত। তারপর শরীরের খিচুনি বন্ধ হয়ে গেল। শান্ত হয়ে গেল লুসি। কাজ শেষ।

আর্থারের হাত থেকে খসে পড়ল হাতুড়ি, সে ধপাস করে বসে পড়ল মাটিতে। কাজটা করে বেদম হাঁপিয়ে গেছে।

'ওর দিকে তাকাও, আর্থার,' বললেন প্রফেসর। 'ওকে এখন দেখো।'

কফিনে যে লুসি শুয়ে আছে সে সেই আগের লুসি। সে আর ভ্যাম্পায়ার নেই। চাঁদের আলো পড়ে স্নিগ্ধ মুখখানা অপরূপ লাগছে।

'ধন্যবাদ, প্রফেসর।' বলল আর্থার। 'জানি ও এখন সত্যি শান্তিতে আছে।'

ওরা করাত দিয়ে কাঠের গোঁজের মাথাটা কেটে ফেলল। তারপর লাশের মাথা কাটল। মুখে পুরে দিল রসুন। প্রফেসর কী কী করতে হবে বললেন, ওরা নির্দেশ পালন করল। অবশেষে কফিনের ডালা বন্ধ করে দিয়ে সবাই সমাধি থেকে বেরিয়ে এলো।

'আমাদের একটা কাজ কমল,' বললেন ভ্যান হেলসিং। 'তবে আসল কাজটাই বাকি রয়ে গেছে। ভ্যাম্পায়ার কাউন্ট ড্রাকুলাকে খুঁজে বের করতে হবে। ওকেও এভাবে গোঁজ ঢুকিয়ে হত্যা করতে হবে। এই কঠিন এবং বিপজ্জনক কাজে তোমরা অংশ নিতে রাজি আছ তো?'

'জ্বি, রাজি আছি।' সমস্বরে বলল ওরা।

'পরিণতি যা-ই হোক এর শেষ দেখে ছাড়বে বলছ?'



পরিণতি যা-ই হোক আর থেমে যাবার অবকাশ নেই

ওরা আবার একসঙ্গে প্রফেসরের কথায় সায় দিল।

'কাল আমরা আবার মিলিত হবো। প্ল্যান-প্রোগ্রাম করতে হবে। এগিয়েছি যখন আমাদের আর থেমে যাবার অবকাশ নেই।'

১৩. রক্তচোষা দানব

মিনা এবং জোনাথন লন্ডনে এসেছে। উঠেছে ডা. সেওয়ার্ডের পাগলাগারদ সংলগ্ন বাড়িতে। সে রাতে ওদের সঙ্গে আর্থার হোমউড এবং কুইন্সি মরিসের পরিচয় হলো। প্রফেসর ভ্যান হেলসিং সবাইকে নিয়ে মিটিং ডাকলেন। পরবর্তী করণীয় ঠিক করবেন।

'কাউন্ট ড্রাকুলাকে খুঁজে বের করাই এখন আসল কাজ,' বললেন তিনি। 'এ দানবটাকে আমাদের হত্যা করতে হবে। কাজেই তাকে খুঁজে বের করতে যা যা তথ্য দরকার সব জোগাড় করে ফেলো তোমরা।'

ওরা ডায়েরি, চিঠিপত্র, খবরের কাগজ ইত্যাদি অনেক কিছু জোগাড় করল। কাউন্ট ড্রাকুলা লন্ডনে আসলে কী মতলবে এসেছে এসব ঘেঁটে সে ব্যাপারে একটা ধারণা নেওয়া যাবে। মিনা প্রতিটি লেখা বাছাই করে তথ্যগুলো সাজিয়ে ফেলল।

'যে পিশাচের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করতে যাচ্ছি তার ব্যাপারে তোমাদের আগে জেনে নেওয়া দরকার,' বললেন প্রফেসর ভ্যান হেলসিং। 'শুনলে অনেক কথাই তোমাদের কারও কারও কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে। তবু সবকিছু জানা থাকলে দানবটাকে খুঁজে বের করতে সুবিধে হবে।'

পৃথিবীতে ভ্যাম্পায়ারের অস্তিত্ব রয়েছে, ওদেরকে জানালেন ভ্যান হেলসিং। এরা হলো আন-ডেড বা জিন্দালাশ। এদের মৃত্যু নেই। এদের একেকজনের গায়ে কুড়ি মানুষের সমান বল। এরা অত্যন্ত চালাক। এদের গায়ে আলো পড়লেও মাটিতে তাদের ছায়া দেখা যায় না, আয়নার সামনে দাঁড়ালে প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে না।

ওরা কী করতে পারে? অনেক কিছুই করার ক্ষমতা ওদের আছে। ওরা ঝড়-বৃষ্টি, ঘনকুয়াশা ইত্যাদি সৃষ্টি করতে পারে। পেঁচা, ইঁদুর এবং



মিনা এবং জোনাথন উঠেছে ডা. সেওয়ার্ডের বাড়িতে

নেকড়েরা ওদের আদেশ মেনে চলে। ওরা আঁধারে দেখতে পায়। ছোট্ট ফোকর গলেও বেরিয়ে যেতে পারে ভ্যাম্পায়ার। বাতাসে মিলিয়ে যায় চোখের পলকে।

'সন্দেহ নেই অত্যন্ত শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাচ্ছি আমরা,' বলল আর্থার। 'কিন্তু ওদের সঙ্গে যদি লড়াইতে হেরে যাই?'

'এ শুধু জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন নয়,' বললেন ভ্যান হেলসিং। 'ব্যর্থ হলে আমাদেরকে ওরা ভ্যাম্পায়ার বানিয়ে ফেলবে। আমরা পরিণত হব কুৎসিত নিশাচরে। আমরা শুধু রাতের অন্ধকারে হেঁটে বেড়াব, জ্যান্ত মানুষের ঘাড় মটকে রক্ত খাব। কাজেই কোন ভুল করা যাবে না, বন্ধুগণ। কারণ একটা ভয়ংকর লড়াই করতে যাচ্ছি আমরা। আমি বুড়ো মানুষ, তোমাদের সাহায্য ছাড়া এই পিশাচদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমরা কি আমাকে সাহায্য করবে?'

সবাই কথা দিল কাউন্ট ড্রাকুলাকে খুঁজে বের করতে তারা সবরকমের সহযোগিতা করবে। ওরা সবাই হাতে হাত রেখে শপথ করল ভ্যাম্পায়ারটাকে ধ্বংস করার জন্যে সবাই মিলে কাজ করবে।

'বুকে সাহস আনো,' বললেন ভ্যান হেলসিং। 'একতাই বল। আমরা দিনে-রাতে উভয় সময়েই কাজ করতে পারব। কিন্তু ভ্যাম্পায়াররা রাত ছাড়া বেরোতে পারে না।'

'তার মানে ওদেরও কিছু দুর্বলতা আছে?' জিজ্ঞেস করল কুইন্সি মরিস।

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন প্রফেসর। 'প্রথমত, জীবনধারণের জন্যে ওদের রক্ত খেতেই হবে। আমাদের মতো নিয়মিত খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাস নেই ওদের। জোনাথন কাউন্ট ড্রাকুলাকে কোনদিন কিছু খেতে কিংবা পান করতে দেখে নি। ওদের খাদ্য শুধু রক্ত। জ্যান্ত প্রাণীর রক্ত পান করে ওরা সবল হয়ে ওঠে। ওদের বয়স কমে যায়। আর রক্ত খেতে না পারলে হয়ে পড়ে দুর্বল।'

ভ্যাম্পায়ারের আরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কেউ ভ্যাম্পায়ারকে আমন্ত্রণ জানালেই কেবল সে ঘরে ঢুকতে পারে, অন্যথায় পারে না। এরপর সে ওই ঘরে যে কোন সময় ঢুকতে পারে।

ড্রাকুলার সকল শক্তি রাতকে ঘিরে। দিনের বেলা সে শক্তিহীন হয়ে পড়ে, তাকে ওই সময় বিশ্রাম নিতেই হয়। সে ঘুমোয় স্বদেশের মাটি দিয়ে



তোমরা কি আমাকে সাহায্য করবে?

বোঝাই কফিনে। এজন্যেই কাউন্ট ড্রাকুলা ট্রানসিলভানিয়া থেকে মাটি বোঝাই বাক্স নিয়ে এসেছে এখানে।

একজন ভ্যাম্পায়ার শুধু সূর্যোদয়, দুপুর এবং সূর্যাস্তের সময় নিজের

চেহারা বদলে ফেলতে পারে, অন্যসময় পারে না। অন্যের সাহায্য ছাড়া তার পক্ষে নদী বা সমুদ্র অতিক্রম করা সম্ভব নয়।'

'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো,' ভ্যান হেলসিং বলে চললেন, 'ভ্যাম্পায়ারকে কীভাবে বাধা দেবো। এর মধ্যে একটি উপায় হলো রসুন। সে ক্রুশ দেখলেও ভয় পায়। আর তাকে হত্যা করার মোক্ষম উপায় হলো গোঁজ বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে মাথা কেটে ফেলা। তখন সে সত্যি সত্যি মারা যাবে।'

'কিন্তু এ ড্রাকুলাটা আসলে কে?' জোনাথন জিজ্ঞেস করল প্রফেসরকে।

'ট্রানসিলভানিয়ার অনেক প্রাচীন একটি পরিবার হলো ড্রাকুলা পরিবার,' বললেন ভ্যান হেলসিং। 'কাউন্ট ড্রাকুলা বিখ্যাত এক যোদ্ধা, সে তুর্কিদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। তবে সে কালো জাদুর চর্চা করত এবং শয়তানের বশ্যতা স্বীকার করে।'

হঠাৎ পিস্তলের গুলির আওয়াজে চমকে গেল সবাই।

লাফ মেরে খাড়া হলো ডা. সেওয়ার্ড, ছুটে গেল জানালায়। বাইরে কুইন্সি মরিসকে দেখতে পেল। কেউ খেয়াল করে নি কখন মরিস বাইরে গেছে।

'গুলি করার জন্যে দুঃখিত,' বলল সে। 'একটা বিরাট বাদুড়কে জানালায় উড়তে দেখেছি আমি। বাদুড় আমি খুব ঘেন্না করি।'

'গুলি লেগেছে?' জিজ্ঞেস করল আর্থার।

'মনে হয় না। কারফ্যাক্সের দিকের জঙ্গলে উড়ে গেল দেখলাম।'

কুইন্সি ঘরে ঢুকল। অংশ নিল আলোচনায়।

'আমি চমকপ্রদ একটি তথ্য পেয়েছি,' বলল মিনা। 'পঞ্চাশ বাক্স মাটি জাহাজে করে হুইটবিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাক্সগুলো কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, জানেন? কারফ্যাক্স এস্টেটে।'

'ড্রাকুলা তাহলে কাছে-পিঠেই আছে,' বলল আর্থার।

'হয়তো এ কারণেই রেনফিল্ড অদ্ভুত আচরণ করছে,' বলল ডা. সেওয়ার্ড।



হঠাৎ পিস্তলের গুলির আওয়াজে চমকে গেল সবাই

'ঘটনাটা বলো তো শুনি,' বললেন প্রফেসর।

'মাঝে মাঝে দিব্যি সুস্থ মানুষের মতো আচরণ করে রেনফিল্ড। আবার কখনও কখনও রীতিমতো বুনো হয়ে ওঠে। বেশ কয়েকবার ও

পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে কারফ্যাক্সে গেছে। প্রায়ই ওকে প্রভু! প্রভু! বলে উচ্চস্বরে ডাকাডাকি করতে শুনেছি। সে একবার কয়েকজন শ্রমিকের ওপর হামলাও চালিয়েছে। ওরা কারফ্যাক্সে আসা মালপত্রগুলো বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।'

'কী ধরনের মালপত্র?' জানতে চাইলেন ভ্যান হেলসিং।

'কফিন আকৃতির বড়বড় বাক্স।'

'এর অর্থ কী বুঝতে পারছ?' জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর।

'মনে হয় পারছি,' জবাব দিল ডা. সেওয়ার্ড।

'এর অর্থ হলো লন্ডনের নানান জায়গায় লুকিয়ে থাকার প্রস্তুতি নিচ্ছে কাউন্ট ড্রাকুলা। তার মানে ওকে খুঁজে পেতে আমাদের জান কয়লা হয়ে যাবে।'

'আমাদের প্রথম কাজ হলো,' বলল আর্থার, 'কারফ্যাক্সে গিয়ে দেখা কতগুলো বাক্স এসেছে।'

'হ্যাঁ,' বললেন প্রফেসর। 'আজ রাতেই যাব। তবে কাজটা করব আমরা পুরুষরা। মিনার যাওয়ার দরকার নেই।'

'কিন্তু আমি যাব,' বলল মিনা। 'আমি দেখিয়ে দিতে চাই ভ্যাম্পায়ার শিকারে পুরুষদের চেয়ে কোন অংশে কম নই আমি।'

কিন্তু ওরা রাজি হলো না।

'তুমি ঘরে থাকো, ডার্লিং,' বলল জোনাথন। 'এখানে নিরাপদে থাকবে।'

পুরুষরা কারফ্যাক্স এস্টেটে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে, এমন সময় পাগলাগারদের এক রক্ষী ছুটতে ছুটতে এসে ডা. সেওয়ার্ডকে জানাল রেনফিল্ড ডাক্তারকে এক্ষুনি তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছে। খুব জরুরি নাকি কথা আছে।

'যাই, গিয়ে দেখে আসি ও কী বলতে চায়,' অন্যদেরকে বলল ডা. সেওয়ার্ড। 'হয়তো কাউন্ট সম্পর্কে কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও পেয়ে যেতে পারি।'



আমাকে এখান থেকে যেতে দিন

সবাই মিলে গেল রেনফিল্ডের ঘরে। বিছানায় চুপচাপ বসে আছে রেনফিল্ড। তার সঙ্গে সঙ্গীদের পরিচয় করিয়ে দিল ডা. সেওয়ার্ড।

'আর্থার হোমউড,' বলল রেনফিল্ড। 'আমি আপনার বাবাকে চিনতাম।



এর পরিণতি আপনারা দেখতে পাবেন

তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে কষ্ট পেয়েছি। মি. কুইন্সি মরিস, আমি জানি আপনি টেক্সাস থেকে এসেছেন। ওখানে আপনার বিরাট বাড়ি আছে। আর প্রফেসর ভ্যান হেলসিং, আপনার মতো বিখ্যাত বিজ্ঞানীর সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে আমি ধন্য। আমি আপনার সমস্ত বই পড়েছি।'

সবাই ডা. সেওয়ার্ডের দিকে কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকাল। রেনফিল্ডকে দেখে মোটেই পাগল বলে মনে হচ্ছে না। একদম স্বাভাবিক লাগছে।

'তুমি ডেকেছ কেন বলো?' রেনফিল্ডকে জিজ্ঞেস করল ডা. সেওয়ার্ড।

'আমাকে এখান থেকে যেতে দিন,' বলল রেনফিল্ড। 'দেখতেই পাচ্ছেন আমার মাথা এখন পুরোপুরি ঠিক আছে। কাজেই আমাকে পাগলাগারদে পুরে রাখার কোন যুক্তি নেই।'

'ঠিক আছে, বিষয়টি নিয়ে পরে ভেবে দেখব,' বলল ডা. সেওয়ার্ড।

'না, আজ রাতেই আমি যেতে চাই,' বলল রেনফিল্ড। 'এখানে আর একটা সেকেন্ডও থাকতে পারব না। আমার নিজের জন্যে বলছি না। এর পেছনে বিশেষ কারণ আছে।'

'কী কারণ?' জিজ্ঞেস করল ডাক্তার।

'আপনাকে বলতে পারব না।'

'কিন্তু তোমাকে তো এখন ছাড়া যাবে না,' বলল সেওয়ার্ড।

উত্তেজিত হয়ে উঠল রেনফিল্ড। 'প্লিজ, ডক্টর। আমি অনুনয় করছি। প্রয়োজনে আমার সঙ্গে রক্ষী দিয়ে দিন। স্ট্রেটজ্যাকেট পরিয়ে রাখুন। কিন্তু এখানে আমি থাকতে পারব না। আমি আর পাগল নই। দেখতে পাচ্ছেন না? আমি ওর আত্মার জন্যে লড়াই করছি।'

'আমি দুঃখিত,' বলল ডা. সেওয়ার্ড। 'আমরা এখন যাব।'

'আপনি কিন্তু ভুল করছেন,' চিৎকার করে উঠল রেনফিল্ড। 'ভয়ংকর ভুল। এর পরিণতি আপনারা দেখতে পাবেন।'

ওরা বেরিয়ে গেল রেনফিল্ডের ঘর থেকে। প্রস্তুতি সম্পন্ন করে বেরিয়ে পড়ল রহস্যময় এস্টেটের উদ্দেশে।

১৪. দুর্ঘটনা

'বন্ধুগণ, খুবই বিপজ্জনক একটি জায়গায় যাচ্ছি আমরা,' প্রফেসর ভ্যান হেলসিং সতর্ক করে দিলেন তাঁর সঙ্গীদেরকে। 'আমাদের শত্রু অত্যন্ত শক্তিশালী। আমাদের ঘাড় মটকে দেওয়া তার জন্যে কোন ব্যাপারই নয়। প্রচলিত উপায়ে তাকে আঘাত করা সম্ভব নয়। সে যাতে আমাদেরকে বাগে না পায় সে ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে।'

তিনি প্রত্যেককে একটি করে রূপোর ক্রুশ দিলেন, সঙ্গে রসুনের মালা।

'ক্রুশগুলো বুকে ঝুলিয়ে রাখো,' বললেন প্রফেসর। 'আর রসুনের মালা গলায় পরবে।'

ওরা একটি রিভলভার, কয়েকটি ফ্ল্যাশলাইট এবং একগোছা স্কেলিটন কি-ও (এ চাবি দিয়ে সবরকমের তালা খোলা যায়) নিল। কারফ্যাক্সের বিরাট বাড়িটির সামনে চলে এলো ওরা। ডা. সেওয়ার্ড স্কেলিটন কি-র চাবিগুলো দিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করল। একটি চাবি লেগে গেল তালায়। খুট্ করে খুলে গেল তালা।

'দরজার হুড়কো লাগানোর দরকার নেই,' বলল আর্থার। 'এ বাড়িতে বন্দি হয়ে থাকতে চাই না। কাজ শেষ হলেই এখান থেকে কেটে পড়ব।'

মেঝে ধুলোয় ধূসরিত। চারপাশে মাকড়সার জাল। একটা টেবিলে এক গোছা চাবি চোখে পড়ল ওদের।

এ বাড়ি ড্রাকুলাকে কিনে দেওয়ার সময় জোনাথন বাড়ির নকশায় চোখ বুলিয়েছিল। কাজেই বাড়ির কোথায় কী আছে ভালো করেই তার জানা। সে ওদেরকে নিয়ে কাঠের একটি দরজায় পা বাড়াল। দরজায় লোহার বলয় লাগানো। দরজার ওপাশে পুরোনো চ্যাপেল। টেবিলে পাওয়া চাবি দিয়ে দরজার তালা খুলে ফেলল ওরা।



কাউন্ট ড্রাকুলার সেই পরিচিত ভয়ংকর মুখ, লাল চোখ এবং লাল ঠোঁট

'ওয়াক থু!' মুখ বাঁকাল কুইন্সি মরিস, 'কী দুর্গন্ধ রে বাবা!'

চ্যাপেলের ভেতরে সত্যি বিকট গন্ধ। বদ্ধ ঘরে মৃত্যুর গন্ধের সঙ্গে মিশে রয়েছে তাজা রক্তের ঝাঁঝালো গন্ধ। বোটকা গন্ধে ওদের বমি আসার জোগাড়। একবার ভাবল ছুটে পালায়। কিন্তু পালিয়ে যাবার জন্যে তো

আর আসে নি, এসেছে কাউন্ট ড্রাকুলার সন্ধানে। তাকে খুঁজে পেতেই হবে।

চ্যাপেলের মেঝেতে সারবাঁধা মাটি বোঝাই বাক্স। মোট উনত্রিশটি। প্রায় অর্ধেক বাক্স এখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

'অন্য বাক্সগুলো কোথায় গেল? এসো, জায়গাটা একবার সার্চ করে দেখি,' বললেন ভ্যান হেলসিং।

দলটা ছড়িয়ে পড়ল। চ্যাপেলের প্রতিটি কোনা এবং ফাটলে উঁকিঝুঁকি দিল। জোনাথন হঠাৎ একটা মুখ দেখতে পেল এক ঝলকের জন্যে। কাউন্ট ড্রাকুলার সেই পরিচিত ভয়ংকর মুখ, লাল চোখ এবং লাল ঠোঁট। এক সেকেন্ড পরেই অদৃশ্য হয়ে গেল পিশাচটা।

মেঝেয় খসখস শব্দ শুনতে পেল কুইন্সি মরিস। ফ্ল্যাশ লাইটের আলো ফেলল সে। ইঁদুর।

'সারা ঘরে গিজগিজ করছে ইঁদুর,' ফিসফিস করে বলল সে অন্যদেরকে।

শত শত ইঁদুর ছুটে এল ওদেরকে লক্ষ্য করে। হাঁ- করা মুখে ছোট ছোট ধারালো দাঁত।

'এরকম কিছু একটা ঘটার আশঙ্কা আগেই করেছিলাম,' বলল আর্থার। 'তাই প্রস্তুত হয়েই এসেছি।' সে রূপোলি একটি বাঁশি বের করে ফুঁ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে পাশের দরজা দিয়ে উদয় হলো টেরিয়ার জাতের তিনটি কুকুর। তবে প্রথমেই ঘরে ঢুকল না ওরা। দাঁড়িয়ে রইল দোরগোড়ায়। ঘেউ ঘেউ করতে লাগল ইঁদুরগুলোকে লক্ষ্য করে। আর্থার ওদেরকে ঠেলে ঘরে পাঠাল। ওরা আর দ্বিরুক্তি না করে শুরু করে দিল কাজ। তাড়া করল ইঁদুরগুলোকে। থাবা মেরে ধরল, মুখে পুরে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল। দেখতে দেখতে ইঁদুরের বংশ নাশ হয়ে গেল। ইঁদুরগুলো সব সাফ হয়ে যেতে ঘরটি আবার সুনসান রূপ ফিরে পেল, যেন ঘর থেকে একটা শয়তানকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ওরা মূল বাড়িতে এবারে অনুসন্ধান চালাল। এমন কিছু চোখে পড়ল না



দরজা দিয়ে উদয় হলো টেরিয়ার জাতের তিনটি কুকুর

যাতে অনুমান করা যায় কাউন্ট ড্রাকুলা কোথায় লুকিয়েছে। বৃথা খোঁজাখুঁজির পালা যখন শেষ হলো ততক্ষণে পুবাকাশে উঁকি দিয়েছে ভোরের সূর্য। ওরা ডা. সেওয়ার্ডের বাড়িতে ফিরে এলো।

মিনাকে কেমন বিষণ্ন লাগল জোনাথনের। হয়তো স্বামীর জন্যে খুব বেশি চিন্তা করছে বলে মন খারাপ।

সারাদিন ওরা ঘুমাল। মিনাও ঘুমোল। জোনাথন ঘুম থেকে জেগে দেখে তার বউ তখনও ঘুমোচ্ছে। ওকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল জোনাথন। মিনা খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ওর দিকে, যেন চিনতে পারছে না। মিনার চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ।

'কী হয়েছে, ডিয়ার?' জানতে চাইল জোনাথন।

'কাল সারারাত দুঃস্বপ্ন দেখেছি,' বলল মিনা। 'প্রথমে দেখলাম সাদা কুয়াশার একটা চাদর এগিয়ে আসছে এ বাড়িটির দিকে। তারপর নীচতলায় মি. রেনফিল্ড চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন। কার সঙ্গে যেন তিনি জোরে জোরে কথা বলছিলেন। তবে তাঁর কথা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তারপর শুনলাম তিনি মারামারি শুরু করে দিয়েছেন। আমি এমন ভয় পেয়ে গেলাম, চাদর মুড়ি দিয়ে গুটিশুটি মেরে পড়ে রইলাম বিছানায়। নিশ্চয় প্রচণ্ড ক্লান্তির কারণে দুঃস্বপ্নটা দেখেছি।'

'তুমি আসলে কাউন্ট ড্রাকুলাকে নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করছ,' বলল জোনাথন। 'তাই হাবিজাবি স্বপ্ন দেখছ। তোমাকে ড্রাকুলার কথা বলাই উচিত হয় নি। আর বলব না।'

'বলবে,' বলল মিনা। 'আমাকে আসলে একা বাড়ি রেখে যাওয়া তোমাদের উচিত হয় নি।'

সেদিন সকালে প্রফেসর ভ্যান হেলসিং রেনফিল্ডের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। আজ একদম ভিন্ন আচরণ করল সে। মুখ গোমড়া করে বসে রইল বিছানায়, একটা কথাও বলল না। শুধু ভ্যান হেলসিংকে 'বোকা ডাচম্যান' বলে একবার সম্বোধন করে আবার চুপ হয়ে গেল। আবার পাগলামি শুরু হয়ে গেছে তার। জানালার চৌকাঠের চিনি রাখল মাছি ধরার জন্যে। চিনির লোভে মাছি আসতেই ওগুলোকে টপাটপ ধরে খেয়ে ফেলল রেনফিল্ড।

রেনফিল্ড আসলেই একটা উন্মাদ, মনে মনে ভাবলেন ভ্যান হেলসিং। ডা. সেওয়ার্ড ওকে ঘরে আটকে রেখে ঠিকই করেছে।

এদিকে জোনাথন তার সঙ্গীদের নিয়ে আবার অনুসন্ধানে নেমেছে কাউন্ট ড্রাকুলা তার বাড়ি থেকে বাকি একুশটা মাটির বাক্স কোথায় সরিয়েছে দেখতে। এক শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলল জোনাথন। সে জানে বাক্সগুলো কোথায় পাঠানো হয়েছে।

'আমরা ওগুলো লন্ডনের পিকাডিলির একটি বাড়িতে নিয়ে গেছি,' বলল সে। 'এক রোগা-পাতলা লোক ছিল বাড়িটিতে। সে দেখিয়ে দিয়েছিল বাক্সগুলো কোথায় রাখতে হবে। নিজেও বাক্স বহন করেছে। অমন শুঁটকো চেহারার লোকের গায়ে অত শক্তি না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। বড় বড় বাক্সগুলো এমন অনায়াসে হাতে তুলে নিল যেন ওগুলোর কোন ওজনই নেই।'

জোনাথন ঘটনাটা জানাল অন্যদেরকে। ভ্যান হেলসিং বললেন, 'কাউন্ট খুব চালাক। সে মাটিভর্তি বাক্সগুলো নিয়ে আমাদের সঙ্গে যেরকম লুকোচুরি শুরু করেছে, তাকে খুঁজে পাওয়া খুবই মুশকিল হবে বুঝতে পারছি। বাক্সগুলো অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলার আগেই পিকাডিলির ওই বাড়িতে হানা দেব আমরা। দিনের বেলায় বাক্সগুলোয় রসুন গুঁজে দেব। ওই সময় ড্রাকুলা থাকবে নির্জীব, শক্তিহীন। দিনের আলোতে তার আশ্রয়স্থল ধ্বংস করে দিতে হবে।'

সে রাতে ডা. সেওয়ার্ড মিনাকে দেখতে গেল। মিনার শরীর-স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না। এজন্যে চিন্তায় আছে জোনাথন। তার চিন্তা হচ্ছে ভ্যাম্পায়ার শিকারের মানসিক চাপ অসুস্থ করে ফেলেছে মিনাকে। মুখ-চোখ একদম শুকিয়ে গেছে। বিবর্ণ চেহারা।

'আপনাকে বেশি বেশি খেতে হবে, আর বিশ্রাম নেবেন ঠিকমতো,' মিনাকে পরীক্ষা করে দেখে বলল ডা. সেওয়ার্ড।

'আপনি খুব বেশি পরিশ্রম করছেন। এজন্যেই এমন হাল হয়েছে।'



জলদি আসুন ডাক্তার!

চলে গেল ডাক্তার। সে নিজের অফিসে বসে কাজ করছে, এমন সময় পাগলাগারদের এক রক্ষী এসে তার দরজায় করাঘাত করল।

'জলদি আসুন, ডাক্তার!' চেঁচাল সে। 'রেনফিল্ড মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট করেছে।'

১৫. বিপদের মুখে মিনা

ডা. সেওয়ার্ড রেনফিল্ডের ঘরে ঢুকে দেখল তার রোগী মেঝেয়, এক পুকুর রক্তের মধ্যে পড়ে আছে। দেখেই বোঝা যায় মারাত্মক আহত হয়েছে সে। মুখটা ক্ষতবিক্ষত। কেউ যেন বারবার মেঝেয় বাড়ি মেরে থেঁতলে দিয়েছে মুখ।

'ওর পিঠটা বোধহয় গেছে,' বলল রক্ষী। 'ডান হাত এবং পা নাড়াতে পারছে না। ভয়ানক লেগেছে ওর।'

'ওকে তোল। শুইয়ে দাও বিছানায়।' হুকুম দিল ডা. সেওয়ার্ড।

দুজনে মিলে সাবধানে তুলল রেনফিল্ডকে, শুইয়ে দিল খাটে। ডা. সেওয়ার্ড গার্ডকে বলল, 'ড. ভ্যান হেলসিং-এর কাছে যাও। বলো আমি তাঁকে আসতে বলেছি। জলদি!'

ভ্যান হেলসিং খবর পেয়ে ছুটে এলেন। রোগীকে পরীক্ষা করে বললেন, 'ওর এক্ষুনি অপারেশন করতে হবে নইলে মারা যাবে বেচারা।'

গার্ডকে চলে যেতে বলল ডা. সেওয়ার্ড। রেনফিল্ডের জ্ঞান ফেরার পরে তার কথা গার্ডকে শুনতে দিতে চায় না সে।

'ওর খুলি ভেঙে গেছে,' বললেন ভ্যান হেলসিং। 'অপারেশনের পরে হয়তো কথা বলতে পারবে। এ জন্যে দায়ী কে জানা দরকার।'

একটু পরে আর্থার এবং কুইন্সি এলো ছুটতে ছুটতে। আর্থার জানতে চাইল, 'রেনফিল্ডের কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে আমরাও তো জানতে চাই,' বললেন ভ্যান হেলসিং। রেনফিল্ডের ভাঙা খুলি অপারেশনের জন্যে প্রস্তুত হলেন তিনি।

'রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস অনিয়মিত। যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারে সে।



মারাত্মক আহত হয়েছে রেনফিল্ড

নষ্ট করার সময় নেই। ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনাটা জরুরি।'

অপারেশন শেষ হবার পরে ওরা রেনফিল্ডের জ্ঞান ফেরার অপেক্ষা করতে লাগল। হঠাৎ চোখ মেলে চাইল রোগী। চকচকে চোখে তাকাল চারপাশে।

'কোথায় আমি?' বলল সে। 'একটা ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেছি আমি। আমার মুখে ব্যান্ডেজ কেন? কী হয়েছে আমার? আমি নড়াচড়া করতে পারছি না কেন?'

'তোমার স্বপ্নের কথাটা বলো শুনি,' বললেন ভ্যান হেলসিং।

'ড. ভ্যান হেলসিং, আপনি এসেছেন বলে খুব খুশি হয়েছি আমি।' বলল রেনফিল্ড। আবার পুরোপুরি স্বাভাবিক মানুষের মতো আচরণ করছে ও। 'আমি জানি ওটা কোন স্বপ্ন ছিল না। ঘটনাটা সত্যি ঘটেছে। আমি জানি আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে।'

'কী হয়েছে বলো,' তাগাদা দিলেন ভ্যান হেলসিং।

'আপনাদেরকে যে রাতে অনুনয় করে বলছিলাম আমাকে পাগলা গারদ থেকে সরিয়ে দিতে, ঘটনার শুরু সে রাতে। আপনাদেরকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে চেয়েও পারি নি। আপনারা চলে যাবার পরে তিনি কুয়াশার ছদ্মবেশে জানালায় এসে হাজির হলেন।'

'কে হাজির হলো?' ডা. সেওয়ার্ড জিজ্ঞেস করল।

'কে আবার? ড্রাকুলা! তিনি সাদা সাদা তীক্ষ্ণধার দাঁত বের করে হাহা করে হাসছিলেন! ভেতরে ঢুকতে চাইছিলেন। কিন্তু প্রথমে আমি তাঁকে ভেতরে ঢুকতে দিই নি। তখন তিনি আমাকে নানারকম লোভ দেখালেন।'

'কী দিয়ে লোভ দেখিয়েছে?' জানতে চাইলেন ভ্যান হেলসিং।

'জীবনের লোভ,' জবাব দিল রেনফিল্ড। 'বললেন আমাকে মোটা সোটা ডুমো মাছি খেতে দেবেন। জোগাড় করে দেবেন মাকড়সা এবং ইঁদুর। শত শত হাজার হাজার ইঁদুর। সবার শরীরে বইছে তাজা লাল রক্ত, জীবনচাঞ্চল্যে ভরপুর সবাই। তিনি আমাকে দেখালেন বাইরের উঠোনে গিজ গিজ করছে ইঁদুর। ইঁদুরগুলোর ছোট ছোট চোখ তাঁর মতোই লাল।'

'তারপর তুমি ওকে ভেতরে ঢুকতে দিলে?' প্রশ্ন ডা. সেওয়ার্ডের। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে রেনফিল্ডের। মাথা ঝাঁকাল সে।



ড্রাকুলা মিসেস হারকারের জীবনীশক্তি শুষে নিচ্ছেন

'নিজেকে আর সামলে রাখতে পারি নি। জানালা খুলে দিয়ে বললাম– আসুন, প্রভু। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে চলে এলেন তিনি। তারপর সারা দিন আমি অপেক্ষায় ছিলাম কখন তিনি ইঁদুর পাঠাবেন। কিন্তু তিনি ইঁদুর

পাঠান নি। এরপরে প্রতিরাতে তিনি আমার ঘরে আসতে শুরু করলেন। এমনকি অনুমতিরও তোয়াক্কা করতেন না। সোজা ঢুকে পড়তেন ঘরে। যেন এটা তাঁর নিজের বাড়ি। আমার দিকে তাকিয়ে দাঁতমুখ খিঁচতেন।'

'কিন্তু সে আসত কেন?' জিজ্ঞেস করলেন ভ্যান হেলসিং। রেনফিল্ডের অবস্থা খুবই খারাপ। যে কোন সময় মারা যাবে বেচারা।

'কেন?' জবাব দিল রেনফিল্ড, 'মিসেস হারকারের জন্যে। আজ মিসেস হারকারের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তার চেহারা একদম বদলে গেছে। মুখটা কাগজের মতো সাদা। যেন গায়ে এক ফোঁটাও রক্ত নেই। ড্রাকুলা মিসেস হারকারের জীবনীশক্তি শুষে নিচ্ছেন।'

শুনে সবাই আঁতকে উঠল। বুঝতে পারছে ভয়ানক বিপদে আছে মিনা।

আজ রাতে যখন তিনি আমার ঘরে ঢুকলেন আমি তখন প্রস্তুত হয়েছিলাম,' বলে চলল রেনফিল্ড। 'আমি তাঁকে জাপটে ধরলাম। আপনারা তো জানেনই পাগলদের গায়ে অস্বাভাবিক শক্তি থাকে। আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁকে চেপে ধরে রাখলাম। মিসেস হারকারের কাছে তাঁকে আর যেতে দেবো না। ভেবেছিলাম ড্রাকুলাকে গায়ের জোরে হারিয়ে দিতে পারব। কিন্তু ধারণাটা ভুল ছিল। তাঁর চোখের দিকে তাকাতেই কেমন দুর্বল হয়ে পড়লাম। তাঁর চোখ ভাঁটার মতো জ্বলছিল। তিনি নিজেকে চট করে ছাড়িয়ে নিলেন। তারপর আমাকে শূন্যে তুলে নিয়ে দিলেন এক আছাড়। তারপর বারবার ধরে আছাড় মারতে লাগলেন। হঠাৎ সবকিছু আঁধার হয়ে এলো। জ্ঞান হারাবার পূর্ব মুহূর্তে দেখলাম কুয়াশার একটা চাদর দরজার ফাঁক দিয়ে চলে যাচ্ছে।'

'ও তাহলে এখানে,' বললেন ভ্যান হেলসিং। 'আর কেন সে এসেছে তা-ও আমরা জানি। কে জানে চরম সর্বনাশটা হয়েই গেল কি না। সবাই জলদি চলো। প্রতি সেকেন্ড এখন মূল্যবান।'

ওরা চারজন ফিরে এলো নিজেদের ঘরে। ক্রুশ এবং রসুনের মালা নিয়ে হলওয়েতে, মিনা এবং জোনাথনের ঘরের সামনে এসে জড় হলো। ভেতরে ওরা ঘুমোচ্ছে।

'এত রাতে কী ওদেরকে বিরক্ত করা ঠিক হবে?' জিজ্ঞেস করল কুইন্সি মরিস।

'ওদেরকে এখুনি ঘুম থেকে তুলতে হবে,' বললেন ভ্যান হেলসিং।

'না খুললে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকব।'

দরজায় ধাক্কা দিলেন তিনি। দরজা বন্ধ। সবাই মিলে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারল। ভেঙে গেল দরজা। সবেগে ওরা ঢুকে পড়ল ঘরে। যা দেখল, ঘাড়ের পেছনের চুলগুলো সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল, বন্ধ হয়ে আসতে চাইল নিশ্বাস।

জানালা থেকে ভেসে আসা চাঁদের আলোয় ওরা দেখছে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে রয়েছে জোনাথন, মিনা বিছানার কোণে হাঁটু মুড়ে বসা, তার নৈশ-পোশাক রক্তে মাখামাখি। মিনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আপাদমস্তক কালো পোশাকধারী এক ব্যক্তি। ড্রাকুলা! সে এক হাত দিয়ে মিনার নরম হাতদুটো শক্ত করে চেপে ধরে আছে। আরেক হাত দিয়ে চেপে ধরেছে মেয়েটার ঘাড়।

ড্রাকুলা পাঁই করে ঘুরল ওদের দিকে। লাল চোখে তীব্র ঘৃণা। তীক্ষ্ণধার দাঁতগুলো জানোয়ারের মতো পরস্পরের সঙ্গে ঘষা খেয়ে কট্‌কট্‌ শব্দ তুলল। মিনাকে ধাক্কা মেরে বিছানায় ফেলে দিয়ে ওদের দিকে লাফ মারল।

সঙ্গে সঙ্গে ওরা চারজন যে যার হাতের ক্রুশ বাগিয়ে ধরল সামনে। একটা ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল কাউন্ট। ক্রুশ সামনে বাগিয়ে ধরে ওরা কাউন্টের দিকে পা বাড়াল। ঠিক তখন একখণ্ড কালোমেঘ ঢেকে দিল রূপালি চাঁদ, আঁধার হয়ে এলো পৃথিবী। সেই সুযোগে অদৃশ্য হয়ে গেল কাউন্ট ড্রাকুলা। ওরা শুধু দেখল কুয়াশার একটা পর্দা সড়াত করে দরজার ফাঁক দিয়ে চলে গেল।

মিনা বিকট একটা চিৎকার দিল। বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে ও, মুখটা ভূতের মতো সাদা, ঠোঁট, গাল এবং থুতনি রক্তে মাখামাখি। চাউনিতে



নির্জলা আতংক। হাতে কাউন্টের আঙুলের ছাপ এখনও প্রকটভাবে ফুটে আছে।

ডা. সেওয়ার্ড মিনাকে যত্ন করে বিছানায় শুইয়ে দিল। গা ঢেকে দিল চাদরে। আর্থার এবং মরিস কাউন্টকে ধাওয়া করতে গেছে।

মিনিটখানেক পরে জ্ঞান ফিরে পেল জোনাথন।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সে। 'মিনার কী হয়েছে? এত রক্ত কিসের?'

ধীরে ধীরে সব কথা মনে পড়ে গেল জোনাথনের। গায়ে একটা কোট চড়িয়ে বলল, 'ড. ভ্যান হেলসিং এবং ড. সেওয়ার্ড আপনারা মিনার সঙ্গে থাকুন। দেখি শয়তানটার কোন খোঁজ পাই কি-না।'

'না, জোনাথন,' চেঁচিয়ে উঠল মিনা। 'আজ অনেক ঝড়ঝাপটা সয়েছি আমি। এখন তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।'

জোনাথন বউকে জড়িয়ে ধরল। মিনা যে-ই দেখল ওর মুখ এবং গলার রক্ত জোনাথনের শার্টে লেগে গেছে, নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সে।

'না! তুমি আমাকে ছুঁয়ো না,' বলল মিনা। 'আমি নোংরা! আমি নোংরা!'

আর্থার এবং মরিস ফিরে এলো বাড়িতে। আর্থার বলল কাউন্ট জেনে গেছে তার খোঁজ পেতে ওরা তথ্য-প্রমাণ জোগাড়ের চেষ্টা চালাচ্ছে। ওরা কাউন্টের ব্যাপারে যেসব রেকর্ড বা কাগজপত্র জোগাড় করেছিল সব পুড়িয়ে ফেলেছে সে। তবে কাউন্ট জানে না মিনা আগেই ওসব রেকর্ডের একটা নকল তৈরি করে সিন্দুকে পুরে রেখেছে। আর্থার রেনফিল্ডের ঘরে গিয়েছিল। মারা গেছে বেচারা।

কুইন্সি জানাল, সে রেনফিল্ডের ঘরের জানালার ধারে একটা বাদুড়কে উড়তে দেখেছে। বলল, 'আমি ভেবেছি বাদুড়টা কারফ্যাক্সে যাবে এবং সে সুযোগে ওটাকে গুলি করব। কিন্তু ওটা অন্যদিকে চলে গেল। বোধ হয় তার অপর কোন গোপন আস্তানায়।'

ভ্যান হেলসিং মিনাকে বললেন, 'এখন বলো তো মা, ঠিক কী ঘটেছিল।'

'আপনি আমাকে ঘুমের জন্যে যে বড়ি দিয়েছিলেন সেটা আমি খেয়ে নিই,' বলল মিনা। 'কিন্তু তারপরও ঘুম আসছিল না। অবশ্য ঘুমোতে ভয়ও করছিল যদি দুঃস্বপ্ন দেখি। কিন্তু কখন দুচোখ বুজে এসেছে টের পাই নি। হঠাৎ জেগে উঠে দেখি জোনাথন আমার পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। জানালা দিয়ে আসা চাঁদের আলোয় লক্ষ্য করলাম কুয়াশার একটা চাদর



কুয়াশার একটা চাদর দরজার নিচ দিয়ে ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ছে ঘরে

দরজার নিচ দিয়ে ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ছে ঘরে। দেখে আমি খুব ভয় পেয়ে যাই।'

'তুমি আমাকে জাগালে না কেন, সোনা?' বলল জোনাথন।

'চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তুমি মরার মতো ঘুমোচ্ছিলে। হঠাৎ কুয়াশার চাদরে রূপান্তর ঘটল তালগাছের মতো লম্বা, রোগা এক মানুষে। সে আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। পরনে কালো পোশাক তবে তার গায়ের চামড়া ধবধবে সাদা। লাল দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে সুচালো, ধারালো দাঁত। আমি দেখেই তাকে চিনতে পারি।'

'তুমি কাউকে ডাকলে না কেন?' জিজ্ঞেস করলেন ভ্যান হেলসিং।

'ডাকতে চেয়েছিলাম,' জবাব দিল মিনা। 'কিন্তু লোকটা হুমকি দিল চেঁচামেচি করলে সে জোনাথনকে মেরে ফেলবে। কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলল– আমি তৃষ্ণার্ত, খুব খুব তৃষ্ণার্ত। তারপর সে মুখটা নিয়ে এলো আমার গলার ওপর।'

দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে লাগল মিনা। গুঙিয়ে উঠল জোনাথন। মিনা একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার শুরু করল, 'আমার সমস্ত শক্তি হঠাৎ নিশেষিত হয়ে যায়। লোকটা আমাকে অবশেষে বলে– যারা আমাকে হত্যা করতে চাইছে তুমি তাদেরকে সাহায্য করেছ। এখন আমি তোমাকে আমার অনুগত ভৃত্য বানাব তোমার বন্ধু লুসির মতো। আমার সমস্ত নির্দেশ তুমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে।'

'তারপর?' জিজ্ঞেস করলেন ভ্যান হেলসিং।

'সে আঙুলের লম্বা নখ দিয়ে তার বুকের একটা শিরা ছিঁড়ে ফেলল,' বলল মিনা। 'আমার মুখ চেপে ধরল ক্ষতস্থানে। রক্ত চুষে খেতে বলল। চাপের চোটে আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। আমার মুখে বোধহয় লোকটার শরীরের রক্ত ঢুকে গেছে...ওহ্, কী দোষ করেছি আমি? এসব কেন ঘটছে আমার জীবনে?'

'তোমাকে বাসায় একা রেখে যাওয়া আমাদের মোটেই উচিত হয় নি,' বললেন ভ্যান হেলসিং। 'এজন্যেই এ দুর্ঘটনাটা ঘটেছে। তবে ড্রাকুলাকে খুঁজে বের করতে তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হবে আমাদের।'

সবাই প্রফেসরের কথায় সায় দিল।



আমি দেখেই তাকে চিনতে পারি

'তবে যদি দেখি আমি ভ্যাম্পায়ার হয়ে যাচ্ছি,' বলল মিনা, 'যদি দেখি আমার প্রিয় মানুষগুলোর জন্যে হুমকি হয়ে উঠছি তাহলে মৃত্যুই আমার জন্যে শ্রেয়। আমি আত্মহত্যা করব।'

'না!' চেঁচিয়ে উঠলেন ভ্যান হেলসিং। 'তুমি মরতে পার না। মারা গেলে তুমিও ড্রাকুলার মতো জিন্দালাশে পরিণত হবে। তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে। মরবে ড্রাকুলা। ওকে সারা জীবনের জন্যে হত্যা করব আমরা। ওকে খুঁজে পেয়ে নিই তারপর কলজে বরাবর ঢুকিয়ে দেবো মস্ত একটা গোঁজ। ওকে হত্যা করা ছাড়া আমাদের বিকল্প কোন উপায় নেই, মিনা। কোন উপায় নেই।'

১৬. ড্রাকুলার ঘরে

সকালে সবাই আবার একত্রিত হলো। ভ্যাম্পায়ারটাকে কীভাবে পাকড়াও করা যায় সে পরিকল্পনা করছে। আর্থার এবং কুইন্সি জানাল তারা কাউন্ট ড্রাকুলার বাড়ির খোঁজে বেরিয়েছিল।

'তিনটা বাড়ির খোঁজ আমরা পেয়েছি,' বলল আর্থার। 'প্রথমটার কথা সবাই জানেন। ওটা পিকাডিলিতে, লন্ডনের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে। বাকি বাড়ি দুটো শহরের অন্য অংশে, নির্জন রাস্তার ধারে।'

'পিকাডিলির বাড়িটিই আসল,' বললেন প্রফেসর ভ্যান হেলসিং।

'সে ওই বাড়িতেই প্রথমে বাক্সগুলো পাঠিয়েছে। ও বাড়িতেই বোধহয় সে থাকে। কারণ ও বাড়িতে সে যখন ইচ্ছা যেতে-আসতে পারছে, মিশতে পারছে ওখানকার লোকজনের সঙ্গে। ঐ বাড়িতে ঢুকতে পারলে কাউন্টকে হয়তো ফাঁদে ফেলতে পারব।'

'আমরা বুদ্ধিমানের মতো একটা কাজ করেছি,' বলল ডা. সেওয়ার্ড। 'কারফ্যাক্সের বাড়ির বাক্সগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করি নি। কাউন্ট জানে না আমরা তার ঘাঁটির অনেক কাছাকাছি এসে পড়েছি। ওকে খুঁজে বের করার সময় পাচ্ছি আমরা।'

'হুঁ,' সায় দিলেন ভ্যান হেলসিং। 'আমরা সবগুলো বাড়িতে গিয়ে বাক্সে রসুন গুঁজে দিয়ে আসব যাতে কাউন্ট আর ওগুলো ব্যবহার করতে না পারে। সে দিনের বেলা কোন এক সময় তার পিকাডিলির বাড়িতে হয়তো ফিরে আসবে। তার বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। আমরা ওখানে তার জন্যে অপেক্ষা করব।'

'কারফ্যাক্সের বাক্সগুলোর কী হবে?' জানতে চাইল আর্থার।

'যাবার আগে ওগুলোর ফাঁকফোকরে রসুন গুঁজে দিয়ে যাব,' জানালেন



প্রফেসর। 'সে যদি এখানে ফিরেও আসে আর বাক্সে ঢুকতে পারবে না।'

জোনাথন জানাল সে যাচ্ছে না, মিনার সঙ্গে থাকবে। ওকে পাহারা দেবে।

'না, তুমি যাও,' বলল মিনা। 'ড্রাকুলাকে কবজা করতে হলে তোমার সাহায্যের দরকার আছে। তুমি যে কারও চেয়ে ড্রাকুলাকে ভালো চেনো। একমাত্র তুমিই তার সঙ্গে কথা বলেছ। আইনজীবীর পরিচয়ে পিকাডিলির বাড়িতে অন্যদেরকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে ঢুকতে পারবে। আমাকে বসে বসে পাহারা দেওয়ার চেয়ে ড্রাকুলাকে খুঁজে বের করে তাকে ধ্বংস করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।'

স্ত্রীর যুক্তি মেনে নিতেই হলো জোনাথনকে। ওরা রওনা হবার আগে ভ্যান হেলসিং মিনাকে একবার পরীক্ষা করে দেখলেন। ওর মুখ ফ্যাকাসে তবে দাঁত এখনও সুচালো হয়ে উঠতে শুরু করে নি। মিনাকে রক্ষা করার সময় পাওয়া যাবে কিন্তু ড্রাকুলাকে হত্যা করার সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত।

'তুমি এখানে নিরাপদে থাকবে, মিনা,' বললেন ভ্যান হেলসিং।

'সূর্যাস্তের আগে ড্রাকুলা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর আমরা সূর্য ডোবার আগেই ফিরে আসব। তবু যাতে তোমার কোন বিপদ না হয় সেজন্যে এ ক্রুশটা রেখে যাচ্ছি।'

তিনি সোনার একটা ক্রুশ বের করে মিনার কপালে ঠেকালেন। সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ আর্তনাদ ছাড়ল সে। ক্রুশটার ছোঁয়া যেখানটায় লেগেছে, সেখানকার মাংস পুড়ে গেছে। যেন আগুনে পোড়া লোহা দিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া হয়েছে মিনাকে।

মিনা বুঝতে পারল ও ভ্যাম্পায়ার হতে চলেছে। ড্রাকুলাকে যদি ওরা হত্যা করতে না পারে, অনন্তকাল জিন্দালাশ হয়ে পৃথিবীর বুকে বিচরণ করতে হবে ওকে। ভয়ে-আতঙ্কে কেঁদে ফেলল ও।

'ভ্যাম্পায়ারটাকে খুঁজে বের করে হত্যা না করা পর্যন্ত এ দাগটা তোমার কপালে থেকে যাবে,' বললেন ভ্যান হেলসিং। 'তবে তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমরা সফল হবোই।'

ওরা রওনা হচ্ছে, জোনাথন মনে মনে শপথ করল মিনা যদি ভ্যাম্পায়ার হয়ে যায় তাহলে সে নিজেও আর মানুষ থাকবে না, রূপান্তর ঘটাবে



ভ্যান হেলসিং মিনাকে পরীক্ষা করে দেখলেন

ভ্যাম্পায়ারে। মিনাকে ছাড়া ও বাঁচতে পারবে না। তাতে যদি নিজের আত্মা শয়তানের কাছে উৎসর্গ করতে হয় তো তা-ই করবে জোনাথন।

ওরা সদলবলে চলে এলো কারফ্যাক্স এস্টেটে। চলল বিধ্বস্ত চ্যাপেলে।

শেষবার এসে মাটি ভর্তি যে বাক্সগুলো দেখেছিল সেগুলোই চোখে পড়ল। ওরা বাক্সগুলোর ফাঁকফোকরে রসুনের কোয়া গুঁজে দিল, প্রতিটি বাক্সের ওপর রেখে দিল ক্রুশ। ড্রাকুলা যদি ফিরেও আসে বিশ্রাম করার জন্যে কোন বাক্সে ঢোকার সুযোগ আর পাচ্ছে না।

'যদি সহায়তা করে ভাগ্য,' বললেন ভ্যান হেলসিং, 'সূর্যাস্তের আগেই ড্রাকুলাকে আমরা মেরে ফেলতে পারব।'

ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চড়ে ওরা পৌঁছে গেল পিকাডিলিতে। আর্থার এবং জোনাথন এক তালা মেরামতকারীকে নিয়ে এলো। সে ড্রাকুলার বাড়ির দরজার তালা খুলে ফেলল।

ঘরে ঢুকতেই বোটকা একটা গন্ধ ধাক্কা মারল নাকে। ডাইনিং রুমে বাক্সগুলো দেখতে পেল ওরা।

'এখানে একুশটা বাক্স পাঠানো হয়েছে,' বললেন ভ্যান হেলসিং।

'তোমরা বলেছ বারোটি বাক্স কাউন্টের অপর দুটি বাড়িতে আছে। তার মানে এখানে নয়টি বাক্স থাকার কথা।'

'কিন্তু আছে মাত্র আটটি,' গুনে দেখল ডা. সেওয়ার্ড। 'ড্রাকুলা নির্ঘাত শেষ বাক্সটাতে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে।'

'তবে আমরা ওকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলছি,' বললেন ভ্যান হেলসিং। 'অপর বাড়ি দুটোর চাবিও আমরা পেয়ে গেছি। কুইন্সি, তুমি আর আর্থার এই চাবি নিয়ে ওই বাড়িতে যাও। ওখানকার বাক্সগুলোয় রসুন গুঁজে দিয়ে আসবে। আমি এখানে ডা. সেওয়ার্ড এবং জোনাথনকে নিয়ে অপেক্ষা করব। কাউন্ট যে কোন সময় চলে আসতে পারে।'

ওরা তিনজন ড্রাকুলার অপেক্ষায় বসে রইল। ডা. সেওয়ার্ড জোনাথনের মুখের দিকে তাকিয়ে ভেতরে ভেতরে চমকে গেল। বেচারার এ কী দশা হয়েছে! ক-দিন আগেও তারুণ্যে ভরপুর ছিল জোনাথনের চেহারা আর এখন সবগুলো চুল পেকে গেছে, ঝুলে গেছে মুখের চামড়া। বুড়ো মানুষের মতো লাগছে দেখতে। প্রিয়তমা স্ত্রীর চিন্তায় এরকম অবস্থা হয়েছে তার।

ভ্যান হেলসিং তার সঙ্গীদেরকে উৎফুল্ল করতে চাইলেন।

'আজ আমাদের দিন!' বললেন তিনি। 'আজ আর ড্রাকুলা পার পাবে না।'

বাড়িটি আশ্চর্য রকম নিস্তব্ধ। হঠাৎ সদর দরজায় কেউ কড়া নাড়ল। ভ্যান হেলসিং ওদেরকে ইশারায় চুপ থাকতে বলে নিজেই গিয়ে দরজা খুললেন। টেলিগ্রাফ অফিস থেকে এসেছে এক ছোকরা। সে প্রফেসরকে একটি চিঠি দিল।

'কার চিঠি?' জিজ্ঞেস করল জোনাথন।

'তোমার প্রিয়তমা স্ত্রী লিখেছে,' জবাব দিলেন প্রফেসর। 'বলছে ড্রাকুলা কারফ্যাক্সে ফিরে এসেছিল, আবার তড়িঘড়ি করে কোথায় যেন চলে গেছে।'

'তার মানে এখানেই সে আসছে!' বলল জোনাথন, 'বেশ, বেশ।'

দরজায় আবার করাঘাতের শব্দ। ওরা তিনজন সামনে বাড়ল। ওদের কারও হাতে পিস্তল, কারও হাতে ছুরি, সেই সঙ্গে ক্রুশ তো আছেই।

না, ড্রাকুলা নয়, আর্থার এবং কুইন্সি ফিরেছে।

'ঐ বাড়ি দুটোতে গিয়েছিলাম,' বলল আর্থার। 'প্রতিটি বাড়িতে দুটি করে বাক্স দেখলাম। ড্রাকুলা যাতে ওই বাক্সগুলোতে আর ঢুকতে না পারে সে ব্যবস্থা করে এসেছি।'

'চমৎকার,' বললেন প্রফেসর। 'এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কোন কাজ নেই। তবে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে না। সূর্যাস্তের আগেই ফিরতে হবে মিনার কাছে। সন্ধ্যার পরে ওকে ওই বাড়িতে একা রাখা যাবে না।'

তিনি মাত্র কথা শেষ করেছেন, শুনলেন সদর দরজার তালায় কে যেন চাবি ঢোকাচ্ছে। ওরা দ্রুত চলে এলো খাবার ঘরে। কুইন্সি মরিস একজন দক্ষ শিকারী, এ ধরনের পরিস্থিতি সামাল দিতে জানে সে। সে দ্রুত একটি হামলার পরিকল্পনা করে ফেলল। প্রফেসর ভ্যান হেলসিং, ডা. সেওয়ার্ড এবং জোনাথন দাঁড়াল দরজার পেছনে। আর্থার এবং কুইন্সি



ওরা তিনজন সামনে এগোল

লুকিয়ে পড়ল জানালার ধারে। এদিক দিয়ে কেউ ঢুকতে বা বেরুতে পারবে না।

ওরা ভয় ভয় অস্থিরতা নিয়ে অপেক্ষা করছে, শুনতে পেল হলঘর দিয়ে

ধীর পদক্ষেপে কেউ হেঁটে আসছে। হয়তো কাউন্ট কিছু একটা টের পেয়ে গেছে।

হঠাৎ এক লাফে ঘরে ঢুকে পড়ল কাউন্ট। জোনাথন এক ছুটে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল যাতে পালিয়ে যেতে না পারে ড্রাকুলা।

ক্রুদ্ধ গর্জন ছেড়ে ওদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইল কাউন্ট। চোখে শীতল ক্রোধ। ঠোঁট ফাঁক হয়ে বেরিয়ে পড়েছে সুতীক্ষ্ণ শ্বদন্ত। সবাই হাতে ক্রুশ বাগিয়ে ধরে ড্রাকুলার দিকে একযোগে পা বাড়াল। কাউন্টকে মারার জন্যে অকস্মাৎ লম্বা ছুরিটা নিয়ে লাফ দিল জোনাথন।

ড্রাকুলার গতি জোনাথনের চেয়েও দ্রুত। সে লাফিয়ে সরে গেল পেছনে, অল্পের জন্যে ছুরির ফলা তার বুকে ঢুকল না। শুধু কেটে গেল কোটের পকেট, ঝমঝম শব্দে মেঝেয় পড়ল সোনার মোহর।

কাউন্টের চোখ তীব্র ঘৃণা এবং প্রতিহিংসায় দাউদাউ জ্বলছে। ওই ভয়ংকর চোখে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। তার ফ্যাকাসে চামড়া হলুদ-সবুজ রং ধারণ করল। জোনাথন মারার জন্যে আবার ছুরি তুলেছে, ড্রাকুলা চট করে তার হাতের নিচ দিয়ে পিছলে বেরিয়ে গেল। জানালা লক্ষ্য করে বিরাট লাফ দিল সে। কাচ ভেঙে নিচে, উঠোনে গিয়ে পড়ল ডিগবাজি খেয়ে।

ওরা ছুটে এলো জানালায়। দেখল ড্রাকুলা সিধে হয়েছে। কোন ক্ষতি হয় নি তার।

'তোমরা ভেবেছ আমাকে ধ্বংস করবে, না?' বলল সে। 'এজন্যে তোমাদের সবাইকে ভুগতে হবে। আমার প্রতিশোধ নেওয়ার পালা মাত্র শুরু। দেখবে তোমাদের কী দশা করি আমি!'

ঘুরল ড্রাকুলা, দ্রুত পদক্ষেপে উঠোন পেরিয়ে পা বাড়াল আস্তাবলে। আস্তাবলের দরজা খুলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর্থার এবং কুইন্সি ছুটে এলো বাইরে। জোনাথন জানালা বেয়ে নেমে এসেছিল নিচে। কিন্তু আস্তাবলের দরজা ধাক্কা মেরেও খোলা গেল না। ভেতর থেকে বন্ধ করে রেখেছে ড্রাকুলা। দরজা ভেঙে ওরা ভেতরে ঢুকে



অস্ত্রের জন্য ছুরির ফলা তার বুকে ঢুকল না

দেখল নেই কাউন্ট। চলে গেছে।

‘জলদি,’ ভ্যান হেলসিং বললেন তাঁর সঙ্গীদেরকে। ‘সূর্য ডোবার আগেই মিনার কাছে যেতে হবে। আমরা ড্রাকুলাকে ছোট করে দেখেছিলাম। কিন্তু ও অনেক বেশি বিপজ্জনক।’

১৭. আবার ট্রানসিলভানিয়ায়

'ও আমাদেরকে ভয় পেয়েছে,' বললেন ভ্যান হেলসিং। সবাই ফিরে এসেছে ডা. সেওয়ার্ডের ঘরে। 'এজন্যেই পালিয়ে গেছে। এটাকে সুখবরই বলব। ওর কাছে এখন শুধু একটা বাক্স আছে, লুকোবার জায়গায়ও ওই ওটাই। বাক্সটা খুঁজে পেলে হয়, চিরতরে ধ্বংস করে দেবো কাউন্ট ড্রাকুলাকে।'

ওরা বাড়ি ফিরে মিনাকে সব কথা খুলে বলল।

'ওই দানবটার বুকে গোঁজ ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্যে আর তর সইছে না আমার,' বলল জোনাথন। 'ওকে হত্যা করার জন্যে আমি আমার সর্বস্ব দিতেও রাজি।'

'তবে ভুলে যেয়ো না কাউন্ট ড্রাকুলার আত্মাও কিন্তু নির্যাতিত, নিপীড়িত,' বলল মিনা। 'লুসির মতো ওকেও হয়তো চির শান্তির দেশে পাঠিয়ে দেবে তোমরা। তবে ওর ওপর একটু করুণা বোধহয় করা উচিত তোমাদের।'

'ওই পিশাচকে আবার করুণা কিসের,' বলল জোনাথন। 'ওর আত্মাটাকে নরকে পাঠাতে পারলেই আমি খুশি।'

'ওভাবে বোলো না,' অনুনয়ের সুরে বলল মিনা। 'হয়তো একদিন আমারও করুণার দরকার হবে। আমি প্রার্থনা করব কেউ যেন আমার আত্মার মুক্তি এনে দেয়।'

বউয়ের কথা শুনে চোখে জল এসে গেল জোনাথনের। সে ভুলে গিয়েছিল মিনারও ড্রাকুলার মতো ভ্যাম্পায়ারে রূপান্তর ঘটতে পারে। ও মিনার কাছে ক্ষমা চাইল।

রাতের বেলা ভয় পেয়ে ঘুম থেকে জেগে গেল মিনা।



হলঘরে কে যেন এসেছে

'জোনাথন,' ফিসফিসিয়ে বলল সে, 'হলঘরে কে যেন এসেছে।'

জোনাথন মস্ত একটা ছুরি হাতে নিয়ে পা টিপে টিপে এগোল দরজায়। দরজা খুলে দেখল বাইরে বসে আছে কুইন্সি মরিস।

'বসে বসে আপনাদেরকে পাহারা দিচ্ছি,' বলল কুইন্সি। 'ড্রাকুলা যদি ফিরে আসে!'

জোনাথন মিনাকে কথাটা জানাল। ও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ঘুমিয়ে গেল। ভোর পর্যন্ত একটানা ঘুমোল। কিন্তু ঘুম থেকে জেগে উঠেই জোনাথনকে বলল ড. ভ্যান হেলসিংকে যেন এক্ষুনি এখানে চলে আসতে বল।

প্রফেসর আসার পরে মিনা তাকে সম্মোহন করতে বলল।

'আমাকে সম্মোহন করুন। আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারব। তবে জলদি করুন। সময় খুব কম।'

প্রফেসর ভ্যান হেলসিং মিনাকে দ্রুত সম্মোহিত করে ফেললেন। তাঁর ধারণা, মিনার মাধ্যমে ড্রাকুলার কোন খোঁজ মিলবে। তিনি জোনাথনকে ইশারা করলেন অন্যদেরকেও আসতে বলার জন্যে। মিনার কথা সবাই শুনুক।

'তুমি এখন কোথায়?' মিনাকে জিজ্ঞেস করলেন ভ্যান হেলসিং।

'জানি না। চারপাশ অন্ধকার দেখছি।'

'কিছু শুনতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ,' বলল মিনা। 'জলের ছলাত ছলাত শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কানে আসছে লোকের হাঁটাচলার শব্দ, একটা শেকল বেজে উঠল ঝনঝন করে।'

সূর্য পুরোপুরি উঠে গেছে আকাশে। মিনা বালিশে হেলান দিয়ে শুয়েছিল। হঠাৎ জেগে গেল সে। প্রশ্ন করল, 'আমি কি ঘুমের মধ্যে কথা বলছিলাম?'

'খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য দিয়েছ তুমি আমাদেরকে,' জবাব দিলেন ভ্যান হেলসিং। 'কাউন্ট এ মুহূর্তে জাহাজে আছে। শিকলের যে শব্দের কথা তুমি বলেছ ওটা আসলে নোঙর তোলার আওয়াজ। তার মানে জাহাজটা যাত্রা শুরু করেছে।'

'কাউন্ট লন্ডন ছেড়ে চলে যাচ্ছে,' বলল আর্থার।

'হ্যাঁ,' সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর। 'ও পালাবার চেষ্টা



প্রফেসর ভ্যান হেলসিং মিনাকে দ্রুত সম্মোহিত করে ফেললেন

করছিল। সফল হয়েছে। এখন ভেবে বার করতে হবে কীভাবে ওর পিছু নেব।'

'ওর পিছু নিয়ে কী লাভ?' বলল জোনাথন। 'ব্যাটা চলে গেছে। যাক।'

'কেন?' থমথমে গলা প্রফেসরের। 'ওকে খুঁজে বের করে ধ্বংস করতে না পারলে মিনাও তার মতো ভ্যাম্পায়ারে পরিণত হবে। ওকে বাঁচাতে হলে ড্রাকুলাকে খুঁজে বের করতে হবে। ব্যর্থ হওয়া চলবে না কিছুতেই।'

প্রফেসর ভ্যান হেলসিং কুইন্সি এবং আর্থারের সঙ্গে সারাদিন বসে পরিকল্পনা করলেন কীভাবে ড্রাকুলার সন্ধান বের করবেন। ওরা জানে কাউন্ট ট্রানসিলভানিয়ায় ফিরবে। তাই ওরা কৃষ্ণসাগরগামী জাহাজের খোঁজ লাগাল। 'জারিনা ক্যাথেরিন' নামে একটি জাহাজের খোঁজও মিলে গেল। জাহাজটি সেদিন সকালেই রওনা হয়েছে।

ওরা জেটিতে গেল। কথা বলল জেটি অফিসারের সঙ্গে।

'হ্যাঁ,' বলল সে, 'মনে পড়েছে আমার। লম্বা, রোগা-পাতলা, কালো পোশাক পরা এক লোক এসেছিল আমার কাছে। বলেছিল জাহাজে একটি বাক্স পাঠাবে। বাক্সটি সে পাঠিয়ে দিয়েছে। জাহাজ রওনা দেয়ার ঠিক আগে আগে সে আবার আসে। বলে বাক্সটি ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে কি না দেখতে চায়। সে জাহাজে গিয়ে বাক্স দেখে। এরপর হঠাৎ করে কুয়াশায় ঢেকে যায় জাহাজ। তবে জাহাজ রওনা হবার আগে আবার পরিষ্কার হয়ে যায় আবহাওয়া।'

সে রাতে আবার মিটিং বসল।

'কৃষ্ণসাগর দিয়ে ভার্নার উদ্দেশে রওনা হয়েছে জাহাজ,' বললেন ভ্যান হেলসিং। 'তার মানে আমাদের হাতে মোটামুটি সময় আছে। ট্রেনে আগেই পৌঁছে যাব ওখানে।'

'ওখানে যাবার পরে কী করব?' জিজ্ঞেস করল কুইন্সি। 'পুলিশে খবর দেবো?'

'না,' বললেন প্রফেসর। 'পুলিশ কিছু করতে পারবে না। আমরা নিজেদের মতো কাজ করব। ড্রাকুলা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে সেজন্যে আগেই উঠে পড়ব জাহাজে। এ ছাড়া অন্য কোন বিকল্প আমাদের নেই।'


পরদিন ওরা পার হলো ইংলিশ চ্যানেল

পরদিন ওরা পরিকল্পনায় বসল কীভাবে কৃষ্ণসাগরে ভ্রমণ করা হবে। ভ্যান হেলসিং ডা. সেওয়ার্ডকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললেন, 'জন, তুমি নিশ্চয় একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ। মিস মিনা বদলে যাচ্ছে। ওর দাঁত

সুচালো হয়ে উঠতে শুরু করেছে, চাউনিতে বাড়ছে কাঠিন্য। আর প্রায়ই সে নিশ্চুপ হয়ে থাকে। আমরা যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে দ্রুত ভ্যাম্পায়ারে পরিণত হতে শুরু করেছে সে।'

'কাউন্টের শক্তি ওকে এখনও আচ্ছন্ন করে রেখেছে,' বলল ডা. সেওয়ার্ড। 'এজন্যেই আপনি ওকে সম্মোহন করার সময় ও ড্রাকুলা কোথায় আছে বলতে পারছে।'

'আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে। ওর ওপর নজর রেখো।'

রাতের বেলা আবার সকলে মিলিত হলো। ভার্নায় ট্রেনে করে যাচ্ছে ওরা, চূড়ান্ত পরিকল্পনাটি তাই থাকল।

'আমরা চার জন কাল রওনা হয়ে যাব,' বললেন ভ্যান হেলসিং।

'জোনাথন থাকবে মিনার কাছে।'

'না,' বলল মিনা। 'আমাকে ফেলে রেখে যাওয়া চলবে না। আমি জানি কাউন্ট এখনও আমার ওপর ভর করে আছে। সে আমাকে ডাকলে আমাকে তার কাছে যেতে হবে। আপনারা সবাই আমাকে পাহারা দিয়ে রাখবেন। তা ছাড়া কাউন্টের ভ্রমণবৃত্তান্ত জানতে হলে আমাকে আপনাদের প্রয়োজন হবে। প্রতিদিন সকালে আমাকে সম্মোহন করবেন, আমি বলে দেবো কাউন্ট কোথায় আছে, কী করছে।'

মিনার কথায় সায় দিল সকলে। রাজি হলো মিনাকে ওদের সঙ্গে নিয়ে যেতে। আর্থার এবং কুইন্সি স্টেশনে গিয়ে সবার জন্যে টিকেট কিনে নিয়ে এলো। পরদিন ওরা পার হলো ইংলিশ চ্যানেল, চলল কৃষ্ণসাগর অভিমুখে।

কয়েকদিন পরে ওরা ভার্না পৌঁছাল। ওদের হাতে যথেষ্ট সময় রয়েছে। জারিনা ক্যাথেরিনের চিহ্নও নেই কোথাও। জাহাজটি কোথায় নোঙর করছে তা জানার একটা বন্দোবস্ত করে ফেলল আর্থার। কিন্তু প্রতিদিন একই খবর পেল ওরা, 'জাহাজের কোন পাত্তা নেই।'

প্রতিদিন সকালে মিনাকে সম্মোহিত করেন প্রফেসর ভ্যান হেলসিং।

প্রতিদিন একই খবর শোনায় মিনা : 'চারদিক অন্ধকার। আমি শুধু জলের শব্দ পাচ্ছি।'

ওরা বুঝতে পারছে জাহাজ এখনও সাগরেই রয়েছে, আসছে ভার্না অভিমুখে।

'জাহাজ ঘাটে ভেড়ার পরে,' ভ্যান হেলসিং অন্যদেরকে বললেন, 'সূর্যাস্তের আগেই জাহাজে উঠে পড়ব আমরা। ড্রাকুলা তার বাক্সে শুয়ে থাকবে। দিনের বেলা কিছুই করতে পারবে না সে। আমাদের ওপর নির্ভর করবে তার বাঁচা-মরা।'

'জাহাজে উঠতে কোন সমস্যা হবে না,' বলল আর্থার। 'কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়ে উঠে পড়ব জাহাজে। এ দেশে ঘুষ দিয়ে সবকিছু করা যায়।'

ওরা উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। জাহাজ ঘাটে ভিড়লেই ওতে উঠে পড়বে। আর্থার কাস্টমসের লোকদেরকে বলল ইংল্যান্ডে, তার বন্ধুর মূল্যবান কিছু জিনিসপত্র খোয়া গেছে। ওদের বিশ্বাস, ভার্নাগামী জাহাজটিতে চুরি যাওয়া জিনিসগুলো পাচার হচ্ছে। কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ওদেরকে জাহাজ সার্চ করার অনুমতি দিল। প্রফেসর তাঁর বৈঠকে বললেন, জাহাজে উঠে তিনি আর ডা. সেওয়ার্ড প্রথমে ড্রাকুলার বুকে কাঠের গোঁজ ঢুকিয়ে দেবেন তারপর মস্তক ছেদন করবেন। ওই সময় জোনাথন, কুইন্সি এবং মরিস বন্দুক হাতে পাহারায় থাকবে যাতে কেউ ওদের ব্যাপারে নাক গলাতে না পারে।

'ভ্যাম্পায়ারের আত্মা শরীর থেকে একবার বেরিয়ে আসতে পারলে ওটার শরীর ধুলোয় পরিণত হবে,' বললেন ভ্যান হেলসিং 'কোন প্রমাণ থাকবে না।'

অবশেষে আকাঙ্ক্ষিত খবরটি পাওয়া গেল। জারিনা ক্যাথেরিন কৃষ্ণ সাগরে প্রবেশ করেছে। দু-একদিনের মধ্যে পৌঁছে যাবে ভার্না।

'একদম ঠিক সময়ে আসছে ওটা,' ভ্যান হেলসিং বললেন ডা. সেওয়ার্ডকে। 'মিনার অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। বোধ হয় কাউন্টের আগমনের কারণেই।'



তার মানে আবার আমাদের ফাঁকি দিল ড্রাকুলা!

সারাটা দিন ওদের কেটে গেল প্রস্তুতির ব্যস্ততায়। জোনাথন তার ছুরিটি ঘসে ঘসে ক্ষুরের মতো ধারালো করে তুলল। এদিকে মিনার শরীর আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে। সকালে ওকে সম্মোহন করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হতে

হলো। কারণ ঘুম থেকে প্রায় জাগলই না মিনা। তবু যে খবরটুকু পাওয়া গেল তাতে নতুনত্ব নেই : জলের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, আর কিছু নয়।

আরও দুটো দিন চলে গেল।

'জাহাজটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল জোনাথন।

'বোধ হয় কুয়াশার কারণে আসতে দেরি হচ্ছে।' বললেন ভ্যান হেলসিং, 'কৃষ্ণসাগরে খুব কুয়াশা পড়ে।'

আরেক দিন গেল। ভার্নার ঘাটে এসে পৌঁছল না জাহাজ। তবে ওইদিন একটা টেলিগ্রাম পেল আর্থার। ওতে লেখা জারিনা ক্যাথেরিন গালাজ-এ নোঙর করেছে।

'গালাজ!' চেঁচিয়ে উঠলেন ভ্যান হেলসিং। 'ওটা তো এখান থেকে কয়েক শ' মাইল দূরে। তার মানে আবার আমাদেরকে ফাঁকি দিল ড্রাকুলা।'

১৮. ড্রাকুলার পিছে

টেলিগ্রামের খবরটি সবাইকে স্তম্ভিত করে দিল। ওরা ভেবেছিল কাউন্ট ওদের সঙ্গে কোন চালাকির চেষ্টা করবে। কিন্তু এভাবে ফাঁকি দিয়ে যে পালাবে তা কারও কল্পনাতেও ছিল না।

ভ্যান হেলসিং তক্ষুনি সবাইকে নিয়ে নেমে পড়লেন কাজে। আর্থারকে পাঠালেন গালাজগামী ট্রেনের টিকিট কিনে আনতে। কুইন্সি এবং জোনাথন গেল জাহাজে ওঠার জন্যে কর্মকর্তাদের অনুমতি নিয়ে আসতে। ডা. সেওয়ার্ডকে নিয়ে মিনার পাহারায় থাকলেন প্রফেসর স্বয়ং।

'অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটেছে, প্রফেসর।' বলল মিনা। 'আমার মনে হচ্ছে কাউন্ট যেন আমাকে আর আগের মতো দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরে নেই। মুঠিটা আলগা হয়ে যাচ্ছে।'

'এর কারণ হলো সে এখন তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে,' বললেন ভ্যান হেলসিং। 'সে আর তোমাকে নিয়ে ভাবছে না। ভাবছে নিজেকে নিয়ে। কীভাবে পালাবে সে চিন্তায় সে অস্থির। তবে আমাদের বিপদ এখনও শেষ হয় নি। ওকে যত দ্রুত পাকড়াও করা সম্ভব করব।'

পরদিন খুব ভোরে দলটা গালাজগামী ট্রেনে চড়ে বসল। সূর্য ওঠার পরে ভ্যান হেলসিং সম্মোহন করলেন মিনাকে।

'এখনও নিকষ আঁধার দেখতে পাচ্ছি আমি,' বলল মিনা।

'জলের ছলাত ছলাত শব্দ পাচ্ছি, সেইসঙ্গে বৈঠার আওয়াজ।'

ওরা ভেবেছিল কাউন্ট খুব বেশি দূরে কেটে পড়ার আগেই গালাজ পৌঁছে যাবে। কিন্তু ট্রেন দেরি করে ফেলল গন্তব্যে পৌঁছতে। পরদিন ভোরে গিয়ে পৌঁছল গালাজে।

ওইদিন সকালেও মিনাকে সম্মোহন করলেন প্রফেসর। মিনার আজকাল

ড্রাকুলার মনের ভেতরে প্রবেশ করতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।

'অদ্ভুত ভাষায় কারা যেন কথা বলছে,' বলল সম্মোহিত মিনা। 'নেকড়ের ডাক শোনা যাচ্ছে।'

দুপুর নাগাদ ওরা গালাজে পৌঁছল। আর্থার এবং কুইন্সি মিনাকে নিয়ে চলে এলো হোটেলে। ভ্যান হেলসিং, ডা. সেওয়ার্ড এবং জোনাথন গেল জেটিতে। জারিনা ক্যাথেরিন-এর কমান্ডার ক্যাপ্টেন ডোনাল্ডসনের সঙ্গে কথা বলল ওরা।

'ইংল্যান্ড থেকে রওনা হবার পরে আবহাওয়া বেশ ভালোই ছিল,' বললেন তিনি। 'এত চমৎকার আবহাওয়া অনেকদিন পাই নি। কৃষ্ণসাগরে প্রবেশ করার পরে ভেবেছিলাম নির্ধারিত সময়ের আগেই পৌঁছে যেতে পারব ভার্না।'

'তারপর কী হলো?' জিজ্ঞেস করলেন ভ্যান হেলসিং।

'হঠাৎ কুৎসিত কুয়াশার কবলে পড়ে গেলাম,' জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন। 'কোথায় যাচ্ছি কিছুই ঠাহর করতে পারছিলাম না। আপনমনে যেন চলছিল জাহাজ। কয়েকজন নাবিক খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। তাদের চিন্তার কারণ ছিল জাহাজের একটি কাঠের বাক্স। যে লোকটা জাহাজে বাক্সটা তুলে দিয়েছে তাকে ওদের পছন্দ হয় নি। ওরা বাক্সটা সাগরে ফেলে দিতে চেয়েছিল। আমি বাধা দিয়েছি। বলেছি বাক্স ফেলে দেওয়ার অধিকার আমাদের নেই। যেখানকার বাক্স সেখানে ওটা পৌঁছে দিতে হবে।'

'তার মানে বাক্সটা আপনি এখানে নিয়ে এসেছেন?' জানতে চাইলেন প্রফেসর।

'কুয়াশা ঠেলে পাঁচ দিন চলেছি আমরা,' বললেন ডোনাল্ডসন।

'কুয়াশা কেটে যাবার পরে দেখি গালাজে চলে এসেছি। তখন আমরা ঘাটে নোঙর করি। সূর্যোদয়ের আগেই এক লোক এসে গালাজে হাজির। কাউন্ট ড্রাকুলার জন্যে ওই বাক্সটা নিয়ে যেতে এসেছে। আমরা খুশি মনে তাকে বাক্সটা দিয়ে দিই।'



এখনও নিকষ আঁধার দেখতে পাচ্ছি

'লোকটার নাম কী?' চেঁচিয়ে উঠল জোনাথন।

'স্কিনস্কি,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'পেত্রফ স্কিনস্কি।'

ওরা শহরে ফিরে এল। কয়েকজন রোমানিয়ানকে জিজ্ঞেস করল পেত্রফ

স্কিনস্কি নামে কাউকে চেনে কি না।

একজন বলল, 'ওই লোক তো মারা গেছে। গির্জার কবরস্থানে গতকাল তার লাশ পাওয়া গেছে। ছিন্নভিন্ন কণ্ঠনালী। বোধ হয় কোন বুনো জন্তুর কাজ।'

ড্রাকুলা তাহলে সত্যি ওদের নাগালের বাইরে চলে গেছে। কিন্তু গেল কোথায়? পরবর্তী করণীয় ঠিক করতে সন্ধের পরে মিটিং বসল।

'ড্রাকুলা নিশ্চয় তার প্রাসাদে ফিরে যাবে,' বলল মিনা। 'আর ওখানে যাবার রাস্তা তিনটা– সড়কপথ, রেলপথ এবং জলপথ। সড়কপথে সে যাবে না। কারণ তাহলে আমরা তাকে সহজেই ধরে ফেলতে পারব। ট্রেনেও সে বাক্স তুলে দেওয়ার ঝুঁকি নেবে না। কারণ ট্রেনে তার বাক্স বুঝে নেওয়ার মতো লোকজন বোধহয় নেই। কাজেই বাকি থাকল শুধু জলপথ। সে জলপথেই গেছে।'

'মিনার কথায় যুক্তি আছে,' বললেন ভ্যান হেলসিং। 'আমি ওকে যতবার সম্মোহন করেছি প্রতিবারই ও জলের শব্দ শোনার কথা বলেছে।'

'আরও আছে,' বলল মিনা। 'কাউন্ট কীভাবে তার প্রাসাদ ছেড়ে এলো? জোনাথন বলেছে জিপসিরা ড্রাকুলার নির্দেশ মেনে চলে। আমার ধারণা, সে প্রাসাদে ফিরে যেতে কয়েকজন জিপসিকে ভাড়া করেছে। ওরা তাকে নদীপথে বর্গোপাসে পৌঁছে দেবে। ওখান থেকে ড্রাকুলার প্রাসাদে যাওয়া খুবই সোজা।'

'তুমি ঠিকই বলেছ,' সায় দিলেন প্রফেসর। 'কিন্তু কাউন্টকে দুর্বল অবস্থায় আমরা পাকড়াও করব কীভাবে?'

'একটা স্টিম বোট ভাড়া নেব,' বলল আর্থার। 'বাষ্পচালিত এই নৌকাগুলো আমি চালাতে জানি।'

'আমি জোগাড় করব কিছু ঘোড়া,' বলল কুইন্সি। 'নদীর পাড় দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যেতে থাকব। বলা যায় না কাউন্ট হয়তো হুট করে কোথাও নেমে পড়তে পারে।'



মিনা এখন নিজেই পরিণত হয়েছে আংশিক ভ্যাম্পায়ারে

সিদ্ধান্ত নেয়া হলো জোনাথন আর্থারের সঙ্গে যাবে। স্টিম বোটে চড়ে খুব দ্রুত জিপসিদের নাগাল পাওয়া যাবে। ড্রাকুলা মিনার যে ক্ষতি করেছে এজন্যে জোনাথন কাউন্টের ওপর মহাখাপ্পা। প্রথম সুযোগেই সে

ড্রাকুলাকে হত্যা করতে চায়। ডা. সেওয়ার্ড ঘোড়ার পিঠে কুইন্সির সঙ্গী হবে।

'মিনাকে নিয়ে আমি ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে ড্রাকুলার প্রাসাদে যাব,' বললেন ভ্যান হেলসিং।

'না, মিনাকে ওখানে নিয়ে যাওয়া চলবে না,' আপত্তি করল জোনাথন।

'না, ও যাবে,' দৃঢ় গলায় বললেন ভ্যান হেলসিং। ড্রাকুলাকে এবারে পালাতে দেয়া যাবে না। তাকে পাকড়াও করতে সবার সাহায্য দরকার। ওর প্রাসাদে আমরা যাব এবং ওখানে সে যাতে আর ঢুকতে না পারে সে ব্যবস্থাও করব।'

প্রফেসরের কথা মেনে নিতেই হলো জোনাথনকে। ওরা ভ্যাম্পায়ার শিকারের জন্যে সবরকমের প্রস্তুতি নিল। অস্ত্র রেডি থাকল নেকড়ের হামলার ভয়ে, আর ক্রুশ নিল ভ্যাম্পায়ার তাড়াতে। জোনাথন মিনাকে একটা পিস্তল দিল। তবে ক্রুশ নিল না মিনা। কারণ সে এখন নিজেই পরিণত হয়েছে আংশিক ভ্যাম্পায়ারে।

১৯. শেষ যুদ্ধ

ট্রানসিলভানিয়ার রহস্যময় পাহাড়পর্বত আর বনজঙ্গল পেরিয়ে তিনদিন ধরে চলল ওরা। স্টিম বোটে বসে মিনার জন্যে দুশ্চিন্তা করছিল জোনাথন। কুইন্সি এবং ডা. সেওয়ার্ড নদীর তীর ধরে ঘোড়ার পিঠে চলেছে। অতিরিক্ত ঘোড়াও নিয়েছে সঙ্গে যদি অন্য কারও প্রয়োজন হয়।

ভ্যান হেলসিং মিনাকে নিয়ে চলেছেন ঘোড়ার গাড়িতে। যত দ্রুত সম্ভব ছুটছেন বর্গোপাস এবং ড্রাকুলার প্রাসাদের উদ্দেশে। একবার ওরা বিশ্রাম নিতে কিছুক্ষণের জন্যে থেমেছিল একটি সরাইখানায়। এক চাষী বউ মিনার কপালে ক্রুশের পোড়া দাগ দেখে সভয়ে পিছিয়ে গেল। তারপর থেকে মিনা হ্যাট দিয়ে ঢেকে রাখছে কপাল।

আর্থার এবং জোনাথন জিপসিদের প্রায় ধরে ধরে অবস্থা এমন সময় ওদের স্টিম বোট নদীর তীব্র স্রোতের মধ্যে পড়ে গেল। বাড়ি খেল পাথরে। জিপসিরা অপেক্ষাকৃত হালকা জলযানে চড়েছে। তারা ওটা নিয়ে পগারপার হলো। পাথরে বাড়ি খেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্টিম বোট। স্টিম বোট মেরামত করতে গিয়ে মূল্যবান সময় অনেকটা নষ্ট হলো।

মিনা এবং ভ্যান হেলসিং-এর যাত্রা ক্রমে দুর্গম হয়ে উঠল। ওরা পাহাড়ের যত ভেতরে ঢুকল, প্রকৃতি ততই রুক্ষ এবং বুনো চেহারা ধারণ করল। রাস্তায় আর কোন গাড়ি ঘোড়া দেখা যাচ্ছে না। একদম নির্জন এলাকা।

মিনা সারা দিন পড়ে পড়ে ঘুমোয়। প্রফেসর ওকে আর জাগালেন না। মিনার জন্যে খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে তাঁর। যতই প্রাসাদের কাছাকাছি হচ্ছেন, ভ্যাম্পায়ারের শক্তি ততই যেন পেয়ে বসছে মিনাকে। কিন্তু ওদের এখন ফিরে যাবার উপায় নেই।

ওরা বোর্গোপাস-এ পৌঁছেছে, মিনা একটা রাস্তা দেখিয়ে বলল, 'এদিক দিয়ে যেতে হবে।'

'তুমি জানলে কী করে?' জিজ্ঞেস করলেন ভ্যান হেলসিং।

'জোনাথন আমাকে বলেছে ড্রাকুলার প্রাসাদে যাবার রাস্তা এটাই।'

সত্যি কী তাই? নাকি মিনাকে প্রাসাদ ভীষণ টানছে বলে সে একটা শর্টকার্ট রাস্তা দেখিয়ে দিল? মিনাকে নিয়ে আরও বেশি চিন্তা হতে লাগল প্রফেসরের। ওরা ডিনার খাওয়ার জন্যে যাত্রাবিরতি দিল। কিন্তু মিনা কিছু খাবে না বলল। তার নাকি খিদে নেই। লক্ষণ মোটেই ভালো নয়।

অবশেষে ড্রাকুলার প্রাসাদ চোখে পড়ল ওদের। এদিকে ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে। ভ্যান হেলসিং রাতের মতো ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নিলেন। মিনাকে ফারের বিছানা করে দিলেন। বিছানার চারপাশে গুঁজে দিলেন রসুন-ফুল।

'আগুনের কাছে এসে বসো, মিনা,' আহ্বান করলেন প্রফেসর।

সিধে হলো মিনা, কিন্তু আগুনের সামনে এলো না। 'আমি আসতে পারব না।'

'ঠিক আছে। বৃত্তটা আমাদেরকে রক্ষা করবে। তুমি যদি বাইরে না যাও ওরাও ভেতরে আসতে পারবে না।'

সারা রাত ঘোড়াগুলো চিঁহিঁহিঁ করে ডাক ছাড়ল আর রশি ছিঁড়ে পালাবার চেষ্টা করল। পিঠে-মাথায় হাত বুলিয়ে ওদের শান্ত করলেন ভ্যান হেলসিং। ভোর হয় হয় এমন সময় নিভে যেতে লাগল আগুন। তুষারপাত শুরু হয়েছে। ওদের চারপাশে উড়ছে তুষারকণা।

তুষারের সাদা সাদা মেঘের মাঝখানে সাদা পোশাক পরা তিনটি মূর্তি দেখতে পেলেন ভ্যান হেলসিং। প্রথমে অবশ্য ভাবলেন ভুল দেখছেন। পরে চোখ রগড়ে নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেই দেখতে পেলেন ওরা তিন নারী। জোনাথন যে তিনজনকে ড্রাকুলার প্রাসাদে দেখেছিল এরা সেই তিনজন। ওরা কাছে এগিয়ে এল তবে রসুনের বৃত্তের মধ্যে ঢুকতে পারল না।

মিষ্টি গলায় মিনাকে ডাকল তারা। 'এসো বোন, আমাদের কাছে এসো। এসো।'

ভ্যান হেলসিং দেখে খুশি হলেন মিনা ওদের দিকে আতংকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এখনও ও পুরোপুরি ভ্যাম্পায়ার হয়ে ওঠে নি বোঝা যাচ্ছে। সূর্য উঠছে, তিন নারীমূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল।

জিপসিরা তাদের নৌকায় নিয়ে আসা কাঠের বাক্সটি একটি ওয়াগনে তুলে দিল। লম্বা, খাড়া একটি রাস্তা বেয়ে ওয়াগন চলল ড্রাকুলার প্রাসাদ অভিমুখে। জোনাথন এবং আর্থার স্টিমবোট ছেড়ে উঠে পড়ল ঘোড়ার পিঠে। পিছু নিল ওদের। আরেক রাস্তা ধরে আসছিল ডা. সেওয়ার্ড এবং কুইন্সি, তারাও দ্রুত ছুটতে লাগল।

ভ্যান হেলসিং ঘুমন্ত মিনাকে রেখে একা একা পা বাড়ালেন ভয়ংকর ক্যাসল ড্রাকুলার দিকে। প্রাসাদের দরজা খোলা। তিনি হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে দরজার কবজা ভাঙলেন যাতে ভেতরে ঢোকার পরে কেউ দরজা বন্ধ করে দিতে না পারে। এরপর সার্চ করতে লাগলেন।

প্রথম কবরটা আবিষ্কার করেছেন ভ্যান হেলসিং। দূর থেকে ভেসে এলো নেকড়ের ডাক। তিনি কি মিনার কাছে ফিরে যাবেন? না, সিদ্ধান্ত নিলেন প্রফেসর। মিনাকে যদি নেকড়েরা হামলা করে করুক, তিনি যে কাজে এসেছেন তা শেষ না করে কোথাও যাবেন না।

কবরের মধ্যে সেই তিন নারীমূর্তির একজনকে পেয়ে গেলেন ভ্যান হেলসিং। কী যে সুন্দরী মেয়েটি! অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানার দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে গেলেন প্রফেসর। একে কি সত্যি তিনি হত্যা করতে পারবেন?

দ্বিতীয় সমাধিটি খুঁজে পেলেন প্রফেসর। এ মহিলা আগের জনের চেয়েও সুন্দর দেখতে। আর তৃতীয় সমাধির মেয়েটি রূপসৌন্দর্যে অন্যদেরকে ছাড়িয়ে গেছে। এদেরকে হত্যা করতে হবে ভাবতেই মাথাটা বনবন করে ঘুরতে লাগল প্রফেসরের।

এরপরে চতুর্থ সমাধিটি চোখে পড়ল তাঁর। আকারে অন্যগুলোর চেয়ে বড়। কবরের গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা : ড্রাকুলা। এটাই তাহলে ভ্যাম্পায়ারদের রাজার বাড়ি। কিন্তু কবরে কেউ নেই। খালি। সমাধির

চারপাশে রসুন বিছিয়ে দিলেন প্রফেসর যাতে ড্রাকুলা ফিরে এলেও কফিনে ঢুকতে না পারে।

এরপরে তিন নারীর শরীরে গোঁজ ঢোকানোর কষ্টকর কাজটি শুরু করলেন ভ্যান হেলসিং। গোঁজে প্রতিবার হাতুড়ির বাড়ি মারার সময় তাঁর হাত কেঁপে উঠল। যন্ত্রণায় মেয়েগুলো বিকট সুরে চেঁচাল, গোঙাল, মোচড় খেল শরীর। বিকৃত হয়ে উঠল চেহারা। তবে কাজ শেষ হবার পরে সবার মুখে নেমে এল অপার শান্তির ছায়া। ভ্যান হেলসিং একে একে লাশগুলোর মাথা কেটে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে শরীরগুলো পরিণত হলো ধুলোয়।

প্রফেসর দ্রুত পা চালিয়ে ফিরে গেলেন মিনার কাছে। তার ঘুম ভেঙেছে। অক্ষতই আছে মিনা। নেকড়েরা হামলা করে নি ওকে।

'জলদি,' বলল ও। 'ওরা এগিয়ে আসছে। টের পাচ্ছি আমি। ওদের নাগাল পেতে হলে চলুন।'

পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে নামতে লাগল দুজনে। তুষারঝড়ের মাত্রা বেড়েই চলেছে। ভয়ানক ঠাণ্ডা। পেছন ফিরে তাকাল ওরা। ড্রাকুলার প্রাসাদের ভৌতিক, অশুভ কাঠামোটা ফুটে আছে আকাশের পটভূমিকায়।

মিনা তুষার মাড়িয়ে হাঁটছে। হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছে ওর। রাস্তার পাশে একটি ছোট গুহা চোখে পড়ল ভ্যান হেলসিং-এর। গুহা থেকে পাহাড়ের রাস্তা পরিষ্কার দেখা যায়, চোখে পড়ল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে এদিকে। ওয়াগনটাকে তাড়া করেছে দুই অশ্বারোহী।

'বিনোকিউলারটা চোখে লাগাও,' মিনাকে বললেন প্রফেসর। 'কী দেখছ আমাকে বলো।'

মিনা দূরবর্তী লোকগুলোর দিকে তাকাল। 'ওয়াগনে একটি বাক্স দেখতে পাচ্ছি,' বলল ও। 'বাক্সটিকে ঘিরে কয়েকজন জিপসি বসে আছে। খুব দ্রুত চলছে ওয়াগন। অশ্বারোহীরা ওদেরকে নাগালে পাবে বলে মনে হয় না।'

'সাঁঝের আঁধার ঘনাবার আগেই প্রাসাদে পৌঁছাতে চাইছে জিপসিরা,'



তিনি হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে দরজার কবজা ভাঙলেন

বললেন ভ্যান হেলসিং। 'তবে ওদেরকে এ রাস্তা দিয়েই যেতে হবে। আমরা ওদের বাধা দেবো।'

দ্বিগুণ জোরে তুষারপাত শুরু হলো। তুষারের ভারী পর্দা সামনের দৃশ্যটি ঝাপসা করে দিল। পর্দা সরে গেলে আবার ওদেরকে দেখা গেল।

অনেকটা কাছে চলে এসেছে ওয়াগন এবং তাদের ধাওয়াকারীরা।

'আরে ও তো জোনাথন,' চেঁচিয়ে উঠল মিনা। 'আমি ওকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আর্থার আছে ওর সঙ্গে। আরেকটা রাস্তা দিয়ে আসছে ডা. সেওয়ার্ড এবং কুইন্সি।'

'জিপসিদেরকে আমরা চারপাশ দিয়ে ঘিরে ফেলব,' বললেন ভ্যান হেলসিং। 'তোমার পিস্তল রেডি রাখো। নেকড়ের ডাক শুনতে পাচ্ছি। ওরাও আসছে এদিকে।'

ওরা অপেক্ষা করতে লাগল। জিপসিরা পাহাড় বেয়ে উঠছে। তুষারপাত আস্তে আস্তে কমে এলো, পাহাড়ের মাথায় চলে এসেছে সূর্য। আর অল্পক্ষণ পরেই অস্ত যাবে। তখন কাউন্ট ড্রাকুলা যা খুশি চেহারা ধারণা করতে পারবে। তাকে ধ্বংস করার সুযোগ হয়তো চিরতরে হারাতে হবে।

ভ্যান হেলসিং এবং মিনা যেখানটাতে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে জিপসিরা চলে এসেছে। পেছন পেছন জোনাথনও।

'দাঁড়াও!' হুকুম দিল সে। জিপসিরা ইংরেজি বোঝে না, তবে তাদেরকে কী করতে বলা হয়েছে জোনাথনের অঙ্গভঙ্গি দেখে তারা বুঝতে পারল। ঠিক ওই সময় অপর দিক থেকে ঘোড়া নিয়ে হাজির হয়ে গেল কুইন্সি মরিস এবং ডা. সেওয়ার্ড।

জিপসিদের সর্দার কী যেন একটা হুকুম করল। বাক্স ঘিরে বসে থাকা তার লোকেরা আরও জোরে ছোটাল ওয়াগন।

ওরা পলায়নপর জিপসিদের দিকে রাইফেল তুলল। আর ঠিক তখন হাতে বন্দুক নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন ভ্যান হেলসিং এবং মিনা।

একটা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের জন্যে প্রস্তুত হলো জিপসিরা। তাদের নেতা প্রথমে ওয়াগনে রাখা বাক্সের দিকে ইঙ্গিত করল। তারপর হাত তুলে দেখাল অস্তগামী সূর্য। আর তার পরপরই শুরু হয়ে গেল মারামারি।

জোনাথন একদিক থেকে, কুইন্সি অপরদিক থেকে হামলা চালাল। দুজনেই ওয়াগনের দিকে এগিয়ে যেতে চাইছে। তবে সূর্য অস্ত যাবার আগে ওয়াগনটাকে ওরা ধরতে পারবে কি-না তা ভেবে নিজেরাই শঙ্কিত।



মিনা দূরবর্তী লোকগুলোর দিকে তাকাল

কিন্তু চেষ্টায় বিরতি দিল না। জিপসিদের হাতের উদ্যত ছুরি কিংবা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে নেকড়ের ডাক কোন কিছুই ওদেরকে দমাতে পারল না।

অবশেষে জোনাথন পৌঁছে গেল ওয়াগনে। লাফ মেরে উঠে পড়ল ওটাতে। ভারী বাক্সটা তুলে ধরে উল্টে দিল সে।

কুইন্সি এবং অন্যরা জিপসিদের সঙ্গে মারামারি চালিয়ে গেল। এক জিপসি ছুরি মেরে বসল কুইন্সিকে। কুইন্সি হাত দিয়ে চেপে ধরল ক্ষতস্থান। আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে এলো রক্ত।

মারাত্মক আহত হয়েও মারামারি চালিয়ে গেল সে। হাতের বোয়ি ছুরি বড় বাক্সের ডালার ফাঁকে ঢুকিয়ে চাড় দিল। বাক্স খুলতে জোনাথন তার নিজের ছুরি ব্যবহার করল। ওরা বাক্স খুলতে ব্যস্ত, আর্থার এবং ডা. সেওয়ার্ড ঠেকিয়ে রাখল জিপসিদেরকে।

ভারী বাক্সের ডালা খুলে গেল। ভেতরে শুয়ে আছে ড্রাকুলা। মুখটা বিশ্রী সাদা। চোখের তারায় তীব্র ঘৃণা আর শয়তানি। পাহাড়ের কোলে ডুব দিতে যাচ্ছে সূর্য, দৃশ্যটা দেখে তার মুখে ফুটল বিজয়ের হাসি। সূর্য অস্ত গেলেই তাকে আর কে পায়।

আর ঠিক তখন জোনাথনের ক্ষুরের মতো ধারালো ছুরি ঢুকে গেল ড্রাকুলার গলায়। সঙ্গে সঙ্গে কুইন্সি মরিস বড় বোয়ি ছুরিটি সাঁৎ করে পিশাচটার বুকে ঢুকিয়ে দিল।

এক মুহূর্তের জন্যে কাউন্টের চেহারায় দারুণ শান্তি ফুটল। পরক্ষণে ধুলোয় পরিণত হলো সে।

ড্রাকুলার এহেন দশা দেখে জিপসিরা লেজ গুটিয়ে পালাল।

কুইন্সি মরিস শুয়ে পড়ল মাটিতে। ক্ষতস্থান থেকে এখনও দরদর ধারায় রক্ত পড়ছে। মিনা ছুটে গেল তার কাছে। পুরুষরা ঘিরে দাঁড়াল কুইন্সিকে।

'কেঁদো না, মেয়ে,' মিনাকে বলল কুইন্সি। 'আমি আমার কর্তব্য পালন করলাম মাত্র। এখন মরেও শান্তি। তুমি ড্রাকুলার কবল থেকে এখন মুক্ত।'

শরীরের সবটুকু শক্তি একত্রিত করে মিনার কপালের দিকে আঙুল তুলল সে। অস্তগামী সূর্যের শেষ আবিরে মেখে দিল মিনার ধবধবে সাদা, সুন্দর মসৃণ কপাল। সেই কুৎসিত দাগটা আর নেই।

মুখে মৃদু হাসি নিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল কুইন্সি মরিস।